শুভ উৎসব

(কর্মীদিবস)

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
১লা নভেম্বর, ২০০৫

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

শুভ উৎসব

মুখবন্ধ

এই পরিদৃশ্যমান জগতে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ সমন্বিত এই পৃথিবীর মাঝে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার শুভ জন্মক্ষণ বা জন্মতিথিটি 'জন্মদিন'রূপে চিহ্নিত হয়ে যায়। প্রতিবছর এই দিনটিকে স্মরণ করে সকলের মধ্যে ধরে রাখার জন্য নানারকম আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জন্মদিন বা জন্মতিথি পালন করা হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মঙ্গল কামনায় যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ, দানধ্যান, আত্মীয়, প্রিয়জনদের আমন্ত্রণ, আপ্যায়ন কোনকিছুরই ত্রুটি করা হয় না।

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আগাগোড়া ইতিহাস টেনে আনলে এটাই দেখা যায়, এক মহাকর্মীর কর্মপ্রেরণায় এই অনন্ত সৃষ্টি কর্ম করে চলেছে। মহাকাশের বুকে অনন্ত গ্রহ, নক্ষত্র সবাই আপন আপন কর্ম করে যাচ্ছে। তাদের পারস্পরিক আকর্ষণে বিকর্ষণে এবং আবর্তন বিবর্তনের ধারায় জীবজগৎ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এদের মিলনে, এদের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রতিমুহূর্ত্তে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। আমাদের জন্ম এঁদের থেকেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, ''আমরাও কর্মী। আমাদের জন্মদিবস, কর্মীদেরই জন্মদিবস। তাই আমার জন্মতিথি 'কর্মীদিবস' রূপে পালিত হোক, এটাই আমি চাই। আজ আমার জন্মতিথিতে 'কর্মীদিবস' উপলক্ষ্যে কর্মীবৃন্দ হিসাবে তোমাদের সম্বোধন করছি। তোমরা কর্মী; কর্মই তোমাদের ধর্ম।''

জন্মসিদ্ধ মহানরা যখন এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্মী হয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তার সার্থকতা কতটা এবং তাঁর সন্তান ও ভক্তশিষ্যরা তাতে কতটাই বা উপকৃত হন? শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, ''জীবের ধর্মই পৃথিবীর পর পৃথিবী ঘোরা। এক পৃথিবীতে কেহ কখনও থাকে না, থাকতে পারে না। পৃথিবীর পর পৃথিবী ঘোরার এই যে চক্র, এই যে বারবার আসা যাওয়া, এর থেকে যাতে নিষ্কৃতি পেতে পার, চক্রের ফাঁদে যাতে আর না পড়ো, তার জন্যই আমার এত পরিশ্রম। ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে সেদিন আবার যাতে সবাই আমরা একই স্থানে একত্রিত হতে পারি, সেজন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছি। কারণ আজ হোক, কাল হোক যেতে হবেই। সবাই যে মৃত্যুর সাথে সাথেই সেইস্থানে যাবে, তা নয়। কেহ মৃত্যুর ২৫ বছর পরে, কেহ ৫০ বছর পরে যাবে। আবার এমনও হতে পারে, যাদের হয়তো শত বছর লেগে যেতে পারে।''

কর্মীরাই হচ্ছে সমাজ, সংসার, সত্যতা, সংস্কৃতির স্তম্ভ। স্তম্ভ যেমন ইমারত বা বিল্ডিংকে ধরে রাখে, তেমনি কর্মীরাই সব কিছু ধরে রাখতে পারে। জাতি, সমাজ, সংসার সবকিছুর উত্থান পতন তাদেরই কর্মধারার উপর, কর্মপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

'কর্মীদিবস' তাই তাঁর সকল ভক্তশিষ্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এক পরম পবিত্র দিন, শুভদিন, শুভ জন্মোৎসব বা শুভ উৎসব। এই দিনটির জন্য সারা বছরের দুঃখ-ব্যথা, বেদনা ভুলে পরমপিতার সন্তানেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে, তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বেদতত্ত্ব শ্রবণের আকাঙ্খায়, যা চলার পথের পাথেয়রূপে আগামী দিনগুলিতে নতুন করে কর্মীদের (কর্মে) প্রেরণা যোগায়।

এই অমৃতময় বেদতত্ত্ব আস্বাদনের জন্য চলুন আমরা যাই শুভ উৎসব বা কর্মীদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বেদের সভাগুলিতে; কখনও ত্রিপুরা জেলার উজানচর কৃষ্ণনগরে (অধুনা বাংলাদেশ), কখনও কোলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে, কখনও পার্কষ্ট্রীট, কখনও টালাপার্কে, আবার কখনও বা সুখচর ধামে।

পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বেদতত্ত্ব কখনো একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন মীটিং ও ধর্মসভায় শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী করা হয়েছে। এই

বেদতত্ত্ব পাণ্ডুলিপি, শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশ মত) ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রচারের গুরু দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। তারজন্য একটি সংকলন বিভাগও গঠন করে শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিয়েছেন "**অভিনব দর্শন**"।

"**অভিনব দর্শন**" প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদস্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে অষ্টম শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হল — **শুভ উৎসব**।

পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রীমতি নীহার দাস,। এদের সকলকে জানাই আন্তরিক বৈদিক সম্ভাষণ **রাম নারায়ণ রাম**।

পরিশেষে এই বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন, তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২ — *চপল মিত্র*
১লা নভেম্বর, ২০০৫ — *(প্রকাশক)*

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

		প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ১১৫)
ফোন - ৯৩৩০৯৮০৪২৩
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
৪) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা - ৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

কর্মীদিবসের শপথ

কর্মীদের প্রতীক চিহ্ন রূপে 'কর্মীদিবসে' তোমরা যে ব্যাজ ব্যবহার করবে, তাতে থাকবে স্তম্ভ ও সূর্যের সপ্ত রঙ। স্তম্ভ — যে সব ভার বহন করে। সমাজের যা কিছু ভার সব যদি কর্মীরা স্তম্ভের মত বহন করে, তবেই সমাজ সুন্দর ও সুদৃঢ় হবে। তাই স্তম্ভই হোক তোমাদের প্রতীক চিহ্ন। মহাকর্মী মহাকাশের নীল রঙ; উদারতা ব্যাপকতার প্রতীকস্বরূপ স্তম্ভের রঙ হোক নীলবর্ণ।

সূর্য হলো পরমপিতা। তাঁর সপ্ত রঙ, রামধনু আকারে তোমাদের প্রতিভা বিকাশের প্রেরণা জোগাক। এই যে পৃথিবীর বুকে ফুলে, ফলে, মেঘে, জলে, গাছে পাতায় কত রঙের খেলা, এ সবই সূর্যের ক্ষমতার প্রকাশ। সূর্যের ভিতর সর্ব রঙের সমন্বয়। যার যার টানের তারতম্যে রঙের তারতম্য ঘটছে। সূর্যের ভিতর যে ধাতু আছে, তার যে গন্ধ, তাতেও সর্বগন্ধ জড়িত। টানের তারতম্যে এই জগতে বিভিন্ন গন্ধের প্রকাশ। সূর্যের মধ্যে যে অনন্ত সৃষ্টি ক্ষমতা আছে — তার থেকেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন রূপ। সুতরাং বিশ্ব প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ সবই সূর্যের থেকে পাওয়া।

নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে যেমন আলোর তারতম্যে কতরকম রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়, তেমনি সূর্যের জ্বলন্ত আর জীবন্ত আলোর হেরফেরেই এই জগতের সকল দৃশ্য ম্যাজিকের মত ফুটে উঠছে। তারপর পঞ্চভূতের স্পর্শের সাথে সাথে জীবন্ত হয়ে রূপ নিচ্ছে। সূর্যের সপ্ত রঙ থেকেই সপ্ত সুর। তাই সূর্য আর তার সপ্তরঙ রামধনু হয়ে তোমাদের প্রতীক চিহ্নে জড়িত থাকলো। রামধনু থেকে রামের হাতের ধনুর্বাণের কথাও তোমাদের স্মরণে এসে যাবে। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রামধনু চাই, আবার রামের ধনুকও চাই। দুটোই দরকার।

আমার জন্মতিথি 'কর্মীদিবস' রূপে পালিত হোক, এটাই আমি চাই। প্রতিবছর এই কর্মীদিবসে মহাবিশ্বের সকল কর্মীদের স্মরণ করে আর মহাকাশের কর্মীদের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) মনন করে তোমরা শপথ গ্রহণ করবে — "আমরা মহাকাশের অনন্ত কর্মীদের মত পরস্পরের মধ্যে সমসূত্রে বাঁধা থাকবো, সাধা থাকবো, গাঁথা থাকবো। আমরা তাঁদের মত সমতালে, সমমাত্রায় চলবো। আমরা তাঁদের সঙ্গে সমসুরে, সমভাবে চলবো। তাঁদের অনুসরণ করে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবো।"

শুধু প্রতিজ্ঞা করেই তোমাদের কাজ যেন শেষ হয়ে না যায়। তোমরা তাঁদের আদর্শে বাস্তবে কাজ করে যাবে। দেখবে, তবে আর কোন অভাব অভিযোগ থাকবে না। কর্মের আনন্দে মন ভরপুর হয়ে যাবে। মুক্তিতো সেখানেই।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ ৪৬-তম জন্মতিথি

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট, কোলকাতা
২৩-১০-১৯৬৫ সময় দুপুর ১টা ৩০ মিঃ

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।।

মহাপ্রভু এই নামই দ্বারে দ্বারে গেয়ে গেছেন। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, এই ১৬ নাম ৩২ অক্ষর করে যাবে। এই নামে যে শান্তি আছে, অন্য কিছুতে তত নাই। যে গুরুদত্ত মন্ত্র আছে, তাতো করবেই। আর এই নাম সবসময় করবে। আজ সারা বিশ্বে দেশে দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে শান্তি হওয়ার মত পরিবেশ দেখা যাচ্ছে না। ক্রমশঃ সবকিছু যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে।

আমাদের নাম অস্ত্র সাথে নিয়ে চলতে হবে। মহাপ্রভু যে নাম নিয়ে দ্বারে দ্বারে গেছেন, সেই নাম নিয়েই আমাদের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে। দুর্বল জাতির অস্ত্র সম্বল, সবল জাতির নাম সম্বল। আমরা দুর্বল হলেও নামই আমাদের একমাত্র সম্বল। মূল নাম ও মূল মন্ত্রকে স্মরণ করেই এইসব আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা নামের ভিতর দিয়ে প্রেম আনতে চাই, নামের ভিতর দিয়ে মিলন আনতে চাই, নামের ভিতর দিয়ে মুক্তি আনতে চাই, নামের ভিতর দিয়ে দর্শন, অনুভূতি আনতে চাই। তাই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক এই নাম করবে। আজ কোন প্রোগ্রামের দরকার নাই। যতক্ষণ নাম হবে, তোমরা সুর দেবে। যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে চলছি, তাতে কোন প্রোগ্রামের দরকার নাই। প্রাণভরে নাম কর।

দুর্বল জাতির অস্ত্র সম্বল, সবল জাতির নাম সম্বল। আমরা দুর্বল হলেও নামই আমাদের একমাত্র সম্বল। মূল নাম ও মূল মন্ত্রকে স্মরণ করেই এইসব আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা নামের ভিতর দিয়ে প্রেম আনতে চাই, নামের ভিতর দিয়ে মিলন আনতে চাই, নামের ভিতর দিয়ে মুক্তি আনতে চাই, নামের ভিতর দিয়ে দর্শন, অনুভূতি আনতে চাই।

উঃ আঃ ওঃ স্বরগ্রামেই আছে শান্তির সুর

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল, কোলকাতা
সময় ঃ- সন্ধ্যা ৬-২৩ মিঃ থেকে ৭-৫৫ মিঃ
২৩-১০-১৯৬৫

আমাদের প্রথম কথাই হল, যে পরিস্থিতিতে আমরা আজ উপনীত হয়েছি, যে ঘোলাটে পরিস্থিতি চারিদিক হতে সৃষ্টি হয়েছে, এই ঘোলাটে অবস্থা আমাদেরই সৃষ্টি। আমরা চাই না শান্তিতে বাস করতে। শান্তি চাই মুখে বলি। আমরা চাই না খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে। দেশের ভিতর যে মারামারি, কাটাকাটি, এরজন্য নিজেদের দেশের ভিতর দলীয় স্বার্থপরতাই দায়ী। আগেও এই স্বার্থ ছিল, আজ বেড়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর সমাধান তারা চায় না। এরমধ্যে নীতিবাক্য অথবা কোন কথাই কাজে লাগছে না। তার কারণ আমাদের নীতিগত, জাতিগত, ভাষাগত, দেশগত সবকিছুর মধ্যেই গলদ। এই গলদের ফলে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে হুঁচোট খাচ্ছি। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে গলদগুলিকে খুঁজে বের করে নিয়ে তার সমাধান করা। যেখানে স্থায়িত্বের অভাব; এইখানে এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে চলে যেতেই যখন হবে, যেখানে ত্রুটির ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেখানে ত্রুটিগুলিকে অপসারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই গলদের ফলে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে হুঁচোট খাচ্ছি। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে গলদগুলিকে খুঁজে বের করে নিয়ে তার সমাধান করা। যেখানে স্থায়িত্বের অভাব; এইখানে এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে চলে যেতেই যখন হবে, যেখানে ত্রুটির ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেখানে ত্রুটিগুলিকে অপসারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে কোন কথাই বলা চলে না। আধ্যাত্মিকতার সুযোগ নিয়ে দেশে নানারকম অবিচার, অনাচার চলছে। যার ফলে সেই নিয়ে আজ চারিদিকে সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে। আজ আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে নীতির দন্ডকে হাতে নিয়ে বিরাট বিপ্লব আনা। আজ যা কিছু হচ্ছে সবই ভিত্তিহীন। অভাবটাকে বাড়িয়ে তোলাই এদের কাজ। সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে অভাবের কোনরকম কারণ থাকতে পারে না। অভাব যখন আছে, সেটাকে সরিয়ে যাতে শান্তিমতন বাস করা যায়, তার ব্যবস্থা

করা প্রয়োজন। আমরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, তা সমাধান করে চলার দরকার। সে যাক। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে কোন সুষ্ঠু সমাধান আজও হয়নি। কোন ধর্ম কোন দেশে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। খন্ড খন্ড ভাবে বিভক্ত আমাদের দেশের ধর্ম। সব নিয়ে এক অখন্ড ধর্ম করার যে নীতি, তা কোন ধর্মেই দেখা যাচ্ছে না। আমরা চাই নাদ ধ্বনি তত্ত্ব সৃষ্টির নিয়মাবলীর মধ্য দিয়ে। আমরা চাই নিনাদের সুর। সৃষ্টি যে আজও এগিয়ে চলছে, তার মধ্যে তো কোনরকম ত্রুটি নেই। তারমধ্যে হারমনি (সুর) রয়েছে সুসজ্জিতভাবে। এর ভিতরে যে সমতার সুর পাওয়া যায়, সেই সুরে চলাই জীবজগতের নিয়ম। সেই সমতার সুর নিয়েই জীবজগৎ। আমাদের ভিতরেও এই দেহবীণাযন্ত্রে শ্বাসে প্রশ্বাসে দর্শনে স্পর্শনে সেই সমতার সুর বয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভিতর সব সময় তার স্ফূরণ হচ্ছে।

তোমরা ভগবানের কথা শুনেছ; শাস্ত্রে পড়েছ, তিনি আছেন। তিনি যে আছেন, কোথায় আছেন? কিভাবে আছেন? কতটুকু ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়? তাঁকে পাবার জন্য কিভাবে কাজ করে যেতে হবে, সবটাই বিশ্বাসের উপর রয়েছে। ভগবানের সঠিক ঠিকানা, তাঁর যে চিহ্ন, তিনি যে আছেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যে দেশের ভগবান স্বপ্ন রাজত্বে, যে দেশের ভগবান কল্পনায়, যে দেশের ভগবান গ্রন্থের পাতায়, তা শক্ত বাঁধুনি বা ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারছে না। সেই দেশের তত্ত্ব হাল্‌কাভাবে কিছু কিছু জনমানসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আজ যাঁরা মহান্, মহাপুরুষ বা ঋষি আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন, যাঁরা বলেছেন ভগবানকে পেয়েছেন, সবটাই আমাদের বিশ্বাসের উপর রয়েছে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তো চলা যায় না। বাবার বাবা, তার বাবা, তার বাবাকে না দেখলেও বুঝা যায় তাঁরা ছিলেন। সূর্য যে আছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমাণিত। এরকম প্রমাণ কোথায়? যার জন্য প্রমাণের অভাবে ধর্ম কোন দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারছে না। কতকগুলি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভিতর, গন্ডীর ভিতর রয়ে যাচ্ছে। ঐ জাতীয় বার্তা

যে দেশের ভগবান স্বপ্ন রাজত্বে, যে দেশের ভগবান কল্পনায়, যে দেশের ভগবান গ্রন্থের পাতায়, তা শক্ত বাঁধুনি বা ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারছে না। সেই দেশের তত্ত্ব হাল্‌কাভাবে কিছু কিছু জনমানসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

যদি বলেন, ভগবান আছেন, সেটাও মিথ্যা। আর ভগবান নেই, তাও মিথ্যা, কারণ প্রমাণের অভাব। তবে আমরা ভগবানকে ডাকবো কি না, বা কি আমাদের করা উচিত? সেটাই চিন্তার বিষয়।

আমাদের খোরাক, ওটাই ব্যথা। সেই ব্যথায় আমরা ব্যথিত। কাজেই কোনটাই বিশ্বাস করতে পারছি না। অমুকে পেয়েছে, তমুকে পেয়েছে, এই শুনে শুনে আর ভয়ে ভীতিতে কাঁহাতক মানা যায়? তবে আমাদের কি করা উচিত? যদি বলেন, ভগবান আছেন, সেটাও মিথ্যা। আর ভগবান নেই, তাও মিথ্যা, কারণ প্রমাণের অভাব। তবে আমরা ভগবানকে ডাকবো কি না, বা কি আমাদের করা উচিত? সেটাই চিন্তার বিষয়।

যে পথে আমরা স্রষ্টাকে পাই বা সেই সত্তাকে পাই, যার উপর নির্ভর করে বিশ্ব প্রকৃতি সব চলছে, আমরা যদি তাতে নির্ভর করে চলতে পারি, তাহলে কারও হিতোপদেশের দরকার হয় না। যার যার চাহিদা, যার যার খোরাক, সেই তো বলবে। যার ক্ষুধা সেই বোঝে। যার বৃত্তি, যার ইন্দ্রিয়, সে নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে। প্রত্যেকের বৃত্তির নিবৃত্তির জন্য কাউকে বলে দিতে হয় না। আমাদের ভিতর ভগবানের তেষ্টা তো জাগে না। ভগবানের তেষ্টা যদি নাই জাগে, তবে অভিনয় করে লাভ কি? বেশীরভাগই অভিনয় করছে। সত্যের জন্য আকাঙ্খা অন্যরকম। সেই তেষ্টা পেলে আমরা জলপান করি; ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করি। ভিতর থেকে সেই ক্ষুধা যদি জেগে থাকে, জেনে নেওয়ার ইঙ্গিত যদি প্রকৃতিগত হয়, শাশ্বত হয়, শাস্ত্রগত হয়, তাহলে তা ভুল নয়। সেই জিনিসের উপর, ভিতর থেকে সেই ক্ষুধা জাগ্রত হওয়ার উপর সবকিছু নির্ভর করছে। সেই জিনিস আমাদের জানতে হয় আশ্রমে, গ্রন্থে, অপরের কাছে। বিদেশে না গেলেও প্রমাণে প্রমাণিত যে, সেই দেশটি আছে। অনেক কিছু পারিপার্শ্বিক ও অন্যান্য অবস্থার উপর সেখানে যাওয়া নির্ভর করে। কেহ না গেলেও সান্ত্বনা থাকবে যে, এই কারণে যাওয়া হয়নি। সেই দেশে, বিদেশে যাওয়া যে যায়, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই।

ভগবানের সত্তা, তার তত্ত্ব, তার প্রমাণ, 'তিনি আছেন' কি 'নেই'

সঠিকভাবে কেহই খুঁজে পাচ্ছে না। এর কোন প্রমাণও দিতে পারছে না। তবু সান্ত্বনার বুলি আছে কিছু কিছু। কিন্তু পিনের খোঁচায় যে সুর, সেই সুর আর জাগছে না; সেই সুরের স্ফূরণ হচ্ছে না। আমাদের ভিতর যদি সেই উন্মাদনা আসতো, সকলেই ধ্যানে, জপে বসে পড়তো। তাহলে, স্বাভাবিকভাবে দেশে শান্তির ঢেউ বয়ে যেত। আবার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে যে এত কথা, তাও তো ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না। কত জন অম্লানভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কত ঋষি মহানরা এসেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাও গ্রহণ করা যাচ্ছে না। যখন হাজার, লক্ষের মধ্যে দু'একজনের হয়, সেটার দাম দেওয়া যায় না। এক সুরে থাকলে সবারই স্ফূরণ হবে, সকলের ভিতরেই জাগবে। তা নয়তো বিশেষতঃ একজনের হবে, আর কারও হবে না, এটা মেনে নেওয়া যায় না। যাদের হবে না, তাদের জন্য আবার অনেক কথা আছে — প্রারব্ধ কর্ম, পূর্বজন্মের ফল, সুকৃতি, দুষ্কৃতি ইত্যাদি। এভাবে ফাঁকি দিয়ে কাজ চলে না। অনেকে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে গেছে। যে কোন জিনিস প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বেশীরভাগই অনেক বানিয়ে বলতে হয়।

আমাদের ভিতর যদি সেই উন্মাদনা আসতো, সকলেই ধ্যানে, জপে বসে পড়তো। তাহলে, স্বাভাবিকভাবে দেশে শান্তির ঢেউ বয়ে যেত। আবার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে যে এত কথা, তাও তো ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না। কত জন অম্লানভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা চাই প্রকৃত তত্ত্ব। যেমন খনন করলে জল পাওয়া যায়; প্রত্যেকেই পাবে। সেই স্রষ্টার নিজের মধ্যে তো কোন ফাঁকি নেই। তবুও কেন আমরা কল্পনার মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছি? যে সুরে বাঁধা আছে সপ্ত সুর, সেই সপ্ত সুর দিয়ে সা রে গা মা পা ধা নি, তাতে তো কোন কল্পনার কথা নেই। যেমন করে ২৬টা অক্ষর দিয়ে ভাষা শেখে, তবে কেন আমরা সেই ভাষা শিখবো না? যেই ভাষা শিখলে বিশ্বের সমস্ত ভাষা শেখা যায়, সেই ভাষার সুর কোথায়? সেই ভাষার সা রে গা মা কোথায়? দৈহিক বৃত্তির বোধের ভাষা সকলের এক, শারীরিক নিয়মের (জন্ম-মৃত্যু)

সেই স্রষ্টার নিজের মধ্যে তো কোন ফাঁকি নেই। তবুও কেন আমরা কল্পনার মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছি? যে সুরে বাঁধা আছে সপ্ত সুর, সেই সপ্ত সুর দিয়ে সা রে গা মা পা ধা নি, তাতে তো কোন কল্পনার কথা নেই।

দিক দিয়ে সকলে যখন এক; এক মাটি, এক জল, এক বাতাস নিয়ে আমরা যখন বাস করি, কাম ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি যখন সকলের এক ছন্দেই গাঁথা, তবে কেন আমরা সেই সুর পাবো না? সেই সুর জানলে, সব জানা হয়ে যায়। সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ একটা ভাষার মধ্যে সজাগ রয়েছে। এই যে আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সমস্ত কিছুর মধ্যে যে সজীবতার সুর তা ভাষার মধ্যেই ন্যস্ত। সেই ভাষার সুরটিকে, সেই তারটিকে যদি জানতে পারি, তাহলেই সব হয়ে যায়। সৃষ্টির নিয়মে বীজ হতে গাছ; গাছ হতে বীজ। সূর্য থেকে পৃথিবী; পৃথিবী থেকে বীজ আকারে জীব। সূর্যের ক্ষমতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা। জীবের ভিতরও সেই সৃষ্টি করার ক্ষমতা। তবে কেন আমরা পারবো না? তবে কেন আমরা ছাড়া ছাড়া ভাবে আজ একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছি? আমাদের করণীয় কি? আমাদের সাধনা কি হওয়া উচিত? আমরা কোন্ জপতপ করবো? কোন্ সাধনার পথ দিয়ে চললে, সেই সুরকে খুঁজে পাবো? সেই সুরটাকে জীবনের চলার পথে, যাত্রার সম্মুখে দেখবো?

প্রকৃতির নিয়মাবলীর ভিতর দিয়ে চিরশাশ্বত যেটা, সেটাই আমাদের পথ। শিশুকে বলতে হয় না, এইভাবে হাসো, এইভাবে কাঁদো, এইভাবে হাত-পা ছোঁড়। শিশুর ওঁয়া ওঁয়াতে আমরা কি পাই? প্রণবের সূর। প্রণব কি করে আসে? মন্ত্র কি করে আসে? ওঁয়া ওঁয়াতে আমরা খুঁজে পাই সেই সুর। মানুষ রোগে, শোকে, দুঃখে কোন্ সুর আওড়ায়? আমরা ব্যথা বা দুঃখ পেলে কোন গান গাই না। কবি বা সাহিত্যিকও সেই কথাই (ব্যথার ধ্বনি) বলে; কুকুর, বিড়ালও তাই বলে। সবাই একটা বুলিই (ধ্বনি) বোল দিয়ে যাচ্ছে। সকল জাতির সকল জীবের মধ্যে যে বোল রয়েছে, তা আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছে। মৃত্যুর সময় গাভী, বিড়াল সবাই ওঃ ওঃ করে। ওঃ ওঃ এটা কোন্ ভাষা? এই ভাষা না আছে কবিতায়, না গ্রন্থে। কিন্তু এটা সকল জীবের মধ্যেই আছে। উঃ উঃ মৃত্যুর বেলায় এটাও ওই একই শব্দ। যখন শ্বাস উঠে যায়, তখন তো বলে না জনগণমন-ভাগ্যবিধাতা। মৃত্যুর সময় যে সুর

শিশুকে বলতে হয় না, এইভাবে হাসো, এইভাবে কাঁদো, এইভাবে হাত-পা ছোঁড়। শিশুর ওঁয়া ওঁয়াতে আমরা কি পাই? প্রণবের সূর। প্রণব কি করে আসে? মন্ত্র কি করে আসে? ওঁয়া ওঁয়াতে আমরা খুঁজে পাই সেই সুর।

দেয়, যে বোল দেয় সেটা ওঃ ওঃ, উঃ উঃ, এক একটা শব্দ। এটা কোন ভাষা নয়; এটা ধ্বনি, একটা সুর। এই সুর সৃষ্টির তত্ত্বে, ধ্বনির তত্ত্বে অন্তর্নিহিত। ধ্বনিটা কিভাবে আসে? ধ্বনিটা নানারকম ঢেউয়ে ঢেউয়ে আসে। বাচ্চা যখন হয়, এই সুরেই আসে। এই একই কথা বলে। পৃথিবী যে ঘুরছে, নানা যন্ত্রপাতি যে ঘুরছে, তা প্রায় একই ধ্বনি। এই সুর ধ্বনি, নাদ।

এই ধ্বনির সাধনা, এই সুর সাধনা কিভাবে দেহের ভিতর হয়? সা রে গা মা প্রথমে যারা বের করলেন, প্রথমাবস্থায় সেটা বিদ্রুপের ভিতরে ছিল। এই সা রে গা মা চর্চা করেই এক একজন বড় বড় ওস্তাদ হয়ে গেলেন। অ আ শিখেই অনেকে বড় বড় কবি হয়ে গেছেন। A B C D শিখেই কতজন বড় বড় সাহিত্য রচনা করে ফেললেন। এই ২৬টা, ৩৬টা অক্ষরের প্যাঁচ বড় সাংঘাতিক। বুঝুক বা না বুঝুক, শুধু বলা হয়েছে, সা সা রে রে এই স্বরগ্রামের চর্চা করে যাও।* তাতেই একদিন সুরজ্ঞ হয়ে যাবে। অ আ, A B C D-র অর্থ কেউ বোঝে না। অর্থ বোধগম্য হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেও যদি কবি, সাহিত্যিক হওয়া যায়, স্বভাবতঃই চঞ্চলমতি শিশু শত বিক্ষিপ্ততার মধ্য দিয়ে যদি বিভিন্ন ভাষা শিখে নিতে পারে, এরজন্য তাদের (শিশুদের) সন্ন্যাস নিতে হয় না, গেরুয়া পরতে হয় না, বনে যেতে হয় না, তবে শত বিক্ষিপ্ততায় শত চঞ্চলতার মধ্যে থেকে আমরা কেন সেই সুর আয়ত্ত করতে পারবো না?

এই ধ্বনির সাধনা, এই সুর সাধনা কিভাবে দেহের ভিতর হয়? সা রে গা মা প্রথমে যারা বের করলেন, প্রথমাবস্থায় সেটা বিদ্রুপের ভিতরে ছিল। এই সা রে গা মা চর্চা করেই এক একজন বড় বড় ওস্তাদ হয়ে গেলেন।

স্রষ্টার কাছে, প্রকৃতির কাছে আমরা শিশু। শিশু সমস্ত ভাষা শিক্ষার অধিকার নিয়ে জন্মায়। একজন বয়স্ক ব্যক্তি যে ভাষা শিখতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম

---

* আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।
বারবার উচ্চারণ করা (চর্চা করা) শাস্ত্র বুঝার (বোধগম্য হওয়ার) চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

হয়ে যায়, সে ভাষা শিখতে একটি বাচ্চার বিশেষ পরিশ্রম হয় না। অনন্ত বিশ্বের ভাষা, সেই মূলধ্বনির মূলসুর যদি আমরা বুঝে নিতে পারি, সেই স্বরগ্রাম সেধে সেধে যদি এগিয়ে যেতে পারি, তবে অনন্ত সুরের সাথে সুর মিলাতে কোন অসুবিধা হবে না। এই স্বরগ্রাম যা রয়েছে, কলাপাতার লেখনীর মতো। সেই সুর আমরা যদি অবিরাম চর্চা করি, সাধনা করি; বাচ্চা শিশু যেভাবে শেখে, ঠিক সেইভাবেই যদি শিখে নেই, আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বপ্রকৃতির সুরকে জানতে পারবো। সেই সুর জানা হয়ে গেলে সব সুর জানা হয়ে যায়। তবে কোন বাধা-বিঘ্ন, অসুবিধা আর থাকে না। আমরা সেই ভাষাই শিখতে চাইছি। আমরা সেই ভাষারই কথা বলছি। পৃথিবী ঘুরছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রতিটি বস্তুরই রূপান্তর আছে, পরিবর্ত্তন আছে, লয় আছে, ক্ষয় আছে। সেই সব বিষয়বস্তুর সুর আছে, নাদ আছে, ধ্বনি আছে। সেই নাদ বা ধ্বনির উপর নির্ভর করেই বা তাকে কেন্দ্র করেই এই জগৎ এগিয়ে চলেছে। শিশু যখন ওঁয়া ওঁয়া করে, যখন কেউ কাঁদে, কতরকম স্বর বের হয়। হাসি কতরকমের, হা হা, হি হি, এগুলো ভাষা।

অনন্ত বিশ্বের ভাষা, সেই মূলধ্বনির মূলসুর যদি আমরা বুঝে নিতে পারি, সেই স্বরগ্রাম সেধে সেধে যদি এগিয়ে যেতে পারি, তবে অনন্ত সুরের সাথে সুর মিলাতে কোন অসুবিধা হবে না।

এখানকার মত আমাদের দেশে যখন খনিগুলি আবিষ্কৃত হয়নি, যখন কেরোসিন ছিল না; সৃষ্টির মধ্যে জীবজন্তু যখন ছিল না, তখন তারা জানতো না, বুঝতো না। আমাদের দেশে, আমাদের সাধারণ সংসারে, সাধারণ সমাজে খনি আছে। না খুঁজে আমরা নির্ভর করছি অন্য দেশের উপর। যেমন খাদ্য, আমাদের দেশে ধান, চাল উৎপন্ন না করে পরমুখাপেক্ষী হয়ে আছি। মনন করে খনন করলেই পাওয়া যায়। সেই বিশ্বের সুর, সেই স্বরগ্রাম রয়েছে আমাদের সাধারণ ঘরে। আমাদের মধ্যে যে সুপ্ত খনি রয়েছে, সেটা কোন আশ্রমের সাধু সন্ন্যাসীর কথা নয়। যা সাধারণ সমাজে কুকুর,

আমাদের মধ্যে যে সুপ্ত খনি রয়েছে, সেটা কোন আশ্রমের সাধু সন্ন্যাসীর কথা নয়। যা সাধারণ সমাজে কুকুর, বিড়াল, মাছির মধ্যে রয়েছে, সেই অফুরন্ত অনন্ত শক্তির ভান্ডার আমাদের এই সাধারণ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারাই খুঁজতে হবে। তারজন্য কোন অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।

বিড়াল, মাছির মধ্যে রয়েছে, সেই অফুরন্ত অনন্ত শক্তির ভান্ডার আমাদের এই সাধারণ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারাই খুঁজতে হবে। তারজন্য কোন অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। এই ইন্দ্রিয়, এই বাহ্য ইন্দ্রিয়ে যা রয়েছে, সেটাকেই খনন করতে হবে। বেশীদূর যেতে হবে না। এরজন্য ভাগফল, কর্মফলের উপর নির্ভর করতে হয় না। সৃষ্টির নিয়মে এটাই বড় কথা। জীবজগৎ যখন পৃথিবীর বুক থেকে এসেছে, পৃথিবী যখন সূর্যের বুক থেকে এসেছে, তখন সম্পূর্ণ পূর্ণ সত্তা নিয়েই জীবের জগতে আবির্ভাব। জানবার জন্যই জীবের এই আগমন, এই আবির্ভাব। যেই ভগবান সকলকার জন্য নয়, যেই দেবতা সকলকার জন্য নয়, যেই ভগবান শাস্ত্রের মধ্যেই আবদ্ধ, সেই ভগবানকে আমরা চাই না। যেখানে জল, বাতাস, সূর্যের আলো সকলের জন্য, আমরা সেই ভগবানকে চাইবো। যেই ভগবান আকাশের মতো, সেই ভগবানকে পাবো। হিন্দুধর্ম, মুসলিম ধর্ম, খৃষ্টধর্ম, জৈনধর্ম ইত্যাদি খন্ড খন্ড ধর্মের মধ্যে, গন্ডীর মধ্যে ভগবান লুকিয়ে থাকবে না। সেই গন্ডীর কথা বলতে আমি আসি নাই।

জীবজগতের সবাই যে নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই আমার নীতি। সেটা আমার কথা নয়, সকলকার কথা। জাতি হচ্ছে আকার, জাতি হচ্ছে নিরাকার। জাতি হচ্ছে বাস্তব। জাতি হচ্ছে 'আছে', জাতি হচ্ছে 'নেই'। জাতি হচ্ছে পূর্ণ। এত আখ্যায় ব্যাখ্যায় অনন্ত রূপের মাঝে জাতি নীতি এক কথা, জাতি সূর্য এক কথা, জাতি বিশ্ব এক কথা। জাতি জীবজগৎ। সুন্দর এই পৃথিবী। এরই মাঝে একই সুর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই অনন্ত সুর আমাদের শিরা উপশিরায় রক্ত কণিকায় টগবগ করছে। সূর্যের মধ্যেও আগুনের গলিত লাভা টগবগ করে ফুটছে। এই টগবগানির মূল শক্তি আমাদের মধ্যে বলীয়ান হয়ে রয়েছে। সেইজন্য আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। কারণ ছাগলের খোরাকে হাতীর তৃপ্তি হয় না। তাদের খোরাক অফুরন্ত ভান্ডারের খোরাক। ক্ষণিকের বৃত্তির নিবৃত্তিতে সাময়িক তৃপ্তি হতে

জীবজগতের সবাই যে নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই আমার নীতি। সেটা আমার কথা নয়, সকলকার কথা। জাতি হচ্ছে আকার, জাতি হচ্ছে নিরাকার। জাতি হচ্ছে বাস্তব। জাতি হচ্ছে 'আছে', জাতি হচ্ছে 'নেই'। জাতি হচ্ছে পূর্ণ।

ক্ষণিকের বৃত্তির নিবৃত্তিতে সাময়িক তৃপ্তি হতে পারে, পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় না। আমরা সেই স্বরগ্রাম খুঁজে পেতে চাই।

পারে, পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় না। আমরা সেই স্বরগ্রাম খুঁজে পেতে চাই। আমি তারই কথা বলতে এসেছি। আজ নীতির কথা বলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে হুঁচোট খাচ্ছি। জানি অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমাকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। পিছপা দিলে চলবে না। আরও ঝড়ের মাঝে, গতির মাঝ দিয়ে আমি জাহাজ চালাচ্ছি। কিন্তু বয়া হয়ে রয়েছি। একবার ডোবে, একবার ভাসে। যখন জানতে পারবে, ভগবান আমাদের ঘরের মধ্যে, তখন আর খুঁজতে হবে না। তখন যা জানলে সব জানা হয়ে যায়, যা পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়, তাই হবে। সৃষ্টির নিয়মে শৈশব হতে বার্ধক্য পর্যন্ত নিয়মের চালে চলে। প্রতি মুহূর্ত্তে জানিয়ে দিচ্ছে, মৃত্যু আমাদের কাছে। মৃত্যু আমাদের সম্মুখে, সবাই জানলেও ভিতর হতে কয়জন জেনেছে? এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছে, 'আর ক'দিন ভাই। যে কদিন আছো, ভোগ করে নাও,' যেন ঠাট্টার কথা। যেতে হবে সত্যি কথা। কিন্তু তা অন্তর হতে আসছে না। জানি যাব, যদি জোর দিয়ে ভিতর থেকে বলতে পারো যাবই, তবে দেখবে অনেক হাল্‌কা হয়ে গেছে। এটা বিনা টিকিটে ভ্রমণের মতো। বিনা টিকিটে গাড়ীতে গেলে যেই রকম তটস্থ থাকে, টিকিট থাকলে সেই রকম তটস্থ থাকে না।

জানি যাব, যদি জোর দিয়ে ভিতর থেকে বলতে পারো যাবই, তবে দেখবে অনেক হাল্‌কা হয়ে গেছে। এটা বিনা টিকিটে ভ্রমণের মতো। বিনা টিকিটে গাড়ীতে গেলে যেইরকম তটস্থ থাকে, টিকিট থাকলে সেই রকম তটস্থ থাকে না।

আমি একবার গাড়ীতে যাচ্ছি, আমার পাশেই এক ভদ্রলোক টিকিট করে নাই। ট্রেনে যে কেউ আসছে যাচ্ছে, সে কেবল এদিক ওদিক করছে, এক একবার বাথরুম যাচ্ছে; কতক্ষণ পরে আবার বেরিয়ে আসছে। সে কি অবস্থা। এক রাত্রিতেই দুশ্চিন্তায় চুল পেকে যাবার উপক্রম। আর এতবড় দুশ্চিন্তা (মৃত্যু) আমাদের মাথার উপরে, আমরা আমলই দিচ্ছি না। যে কথাগুলো জীবনের যাত্রাপথে

এই যে অফুরন্ত সৃষ্টির প্রবাহ চলেছে কোন্ প্রয়োজনে, কার সাড়ায়, কার সত্তায়, কোন্ নীতির উপর, কোন্ ধ্বনির উপর? সেই মূলনীতি আমাদের জানতে হবে। বিশ্ব প্রকৃতি আপন খেয়ালে সাহিত্য রচনা করে চলেছে। সৃষ্টিই হল কবিতা, ছন্দ। সৃষ্টিই হ'ল জাগ্রত কবিতা, জাগ্রত সাহিত্য।

সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পাওয়া দরকার, আমাদের জীবনে সেগুলি (কথাগুলি) বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একদিন দুদিনের শিশু কি কথা বলতে পারে? সে হাত পা ছুঁড়ছে, কোঁকাচ্ছে। শিশুর হাত-পা ছোঁড়ার ভিতর দিয়ে মা সব ধরে নিতে পারে তার সুবিধা অসুবিধা। উ আ কা ইত্যাদি কতগুলি সুর আছে; কা কা হাম্বা হাম্বা, এইগুলি বেশী করে আমাদের জানা উচিত। এই তত্ত্বটা ভাল করে বুঝা উচিত। এই আ উ কু কা, শব্দগুলি (ধ্বনিগুলি) কোথা হ'তে এসেছে, যেই ধ্বনি বা তত্ত্বের উপর নির্ভর করে সৃষ্টি হলো? অগণিত পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ আছে। প্রত্যেকটির মধ্যে সুর আছে, গতি আছে, আলো আছে, প্রাণ আছে, তেজ আছে, সত্তা আছে। এটাকে 'চৈতন্য' নাম দিয়েছে। 'প্রাণ' নাম দিয়েছে। এই যে অফুরন্ত সৃষ্টির প্রবাহ চলেছে কোন্ প্রয়োজনে, কার সাড়ায়, কার সত্তায়, কোন্ নীতির উপর, কোন্ ধ্বনির উপর? সেই মূলনীতি আমাদের জানতে হবে। বিশ্ব প্রকৃতি আপন খেয়ালে সাহিত্য রচনা করে চলেছে। সৃষ্টিই হল কবিতা, ছন্দ। সৃষ্টিই হ'ল জাগ্রত কবিতা, জাগ্রত সাহিত্য। প্রতিটি বস্তুর বস্তুত্বে ছন্দ আছে, কবিতা আছে, বাঁধুনি আছে, দাঁড়ি আছে। সেইভাবে সব কিছু বাঁধা আছে জীবনের চলার পথে। এটা একটা কবিতার ছন্দ। জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে মাত্রায় মাত্রায় সুরে বাঁধা, সাহিত্যের ছন্দে বাঁধা। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ধরার ধারাপাতায় রূপে রূপে এত যে রূপান্তর, সেখানে ছন্দ আছে, কবিতার সুর আছে, দাঁড়ি, কমা আছে, মাত্রা আছে। এর চেয়ে বড় সাহিত্য আর কোথায়?

অনন্ত মহাশূন্যে এই যে এত গ্রহ, উপগ্রহ, এটার স্বরগ্রাম জানতে হবে। এটা জানা অতি সহজ। তা রয়েছে এই উ, আ, ওঁয়া-র ভিতর। একটা হুঁচোট খেলে রক্ত যখন বের হয়, তখন আপনা আপনি ভিতর থেকে শব্দ বেরিয়ে আসে উঃ উঃ; তখন কি কেউ গান গায়? করুণ সুরের মাঝে, ব্যথার সুরের মাঝে 'বাবা গো,' 'মা গো,' এই যে সুরটা আমরা খুঁজে পাই, এটা ভাষার কোন প্রভাবে আসে না। ব্যথা, বেদনা, দুঃখের কোন প্রকাশই এখানকার রাশিয়া, চায়না, আমেরিকার ভাষায় আসে না। জীবজন্তু, পশুপাখী সবার দুঃখ, সেই

ব্যথা, বেদনা, দুঃখের কোন প্রকাশই এখানকার রাশিয়া, চায়না, আমেরিকার ভাষায় আসে না। জীবজন্তু, পশুপাখী সবার দুঃখ, সেই নাদ ধ্বনি বা শব্দের সাহায্যে সবাই একভাবেই করে।

নাদ ধ্বনি বা শব্দের সাহায্যে সবাই একভাবেই করে। এই শব্দ তারা কোথা থেকে নিয়ে এল? লক্ষ লোকের হাট থাকলে দূর থেকে শোনা যায় একটাই ধ্বনি, গুম্ গুম্ ধ্বনি। মেঘের গর্জন গুম্ গুম্ ধ্বনি, বিদ্যুতের চমকে গুম্‌গুম্ ধ্বনি। এই ধ্বনিটাকেই যদি আমরা চর্চা করি, তাহলে পেয়ে যাব বিরাট ধ্বনি। এই ধ্বনি এখানকার কোন অর্থে অর্থবিহীন। কিন্তু এর মাঝেই রয়েছে অনন্ত অর্থের তত্ত্ব সম্ভার। প্লেন যাচ্ছে ওঁ ওঁ ধ্বনি করছে, বাতাস সোঁ সোঁ করছে। সাগরের ঢেউ ফোঁস ফোঁস করছে, সাংঘাতিক ব্যাপার। এই যে শব্দ, এতে এখানকার কোন ভাষার ছোঁয়াচ নাই। সেই উঃ উঃ, ওঃ ওঁয়া, এভাবেই চলছে। সবাই এতে রয়েছে, সবই এতে রয়েছে।

মৃত্যুটাও এই সেই অর্থবিহীন সুর, যার মাঝে অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই অর্থবিহীন সুরই আমরা যদি দিনরাত অবিরাম অনর্গল করে যাই, তাহলেই পেয়ে যাব আসল সুরের সন্ধান। কেউ যদি দিনরাত ওঃ ওঃ করে; কোন অর্থ নেই, স্বাদ নেই, চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, একটি মাত্র শব্দ ওঃ ওঃ, পাগলের মত চলছে শব্দ যেন। তাতে কি হবে? যদি দিনরাত করে, অন্যেরা পাগল বলবে। সা সা রে রে করতে গিয়ে পাড়ার লোক লাঠি নিয়ে এসেছে। তারপর ১২ বছর পর জানালা খুলে দিয়েছে, 'কি সুন্দর সুর, একটু শুনতে দাও না ভাই।' সা সা করতে করতে একটা ধাঁচে এসেছে। সেইরূপ এই ওঃ ওঃ শব্দ, ওঁ ওঁ শব্দ, এক একটা শব্দ ধ্বনি, যেটা জন্ম হতেই রয়েছে, শোকে রয়েছে, মৃত্যুতে রয়েছে। শিশু করছে এই ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনি। প্রসব করতে গিয়ে মায়েরা করছে। সন্তানের জন্ম হচ্ছে উঃ উঃ। তখন প্রফেসর আর সাহিত্যিকের কোন ভাষা নেই। কিন্তু এর মধ্য দিয়েও শান্তির সুর বয়ে যায়, যেন কত আরাম। রোগ হলেও ওঃ ওঃ, যেন কত শান্তি। যখনই কোন কাজ করতে যায়, যখন মাল (বোঝা) নিয়ে যায় হেঁইও হেঁইও করে। উঃ, আ, ওঃ এই ধ্বনিগুলোই আমাদের জানা দরকার।

মৃত্যুটাও এই সেই অর্থবিহীন সুর, যার মাঝে অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই অর্থবিহীন সুরই আমরা যদি দিনরাত অবিরাম অনর্গল করে যাই, তাহলেই পেয়ে যাব আসল সুরের সন্ধান।

জঙ্গলে যাও কু, কা শব্দ, সাগরে ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে, বাতাসে

নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে গুরুপ্রদত্ত শব্দ ধ্বনি বারবার অন্তরে উচ্চারণ করতে হয়, সেটাই জপ। ওঁ এই শব্দ ধ্বনিকে বেদ প্রণব মন্ত্র রূপে অভিহিত করেছে। অনন্ত শব্দ ভান্ডার হতে এই একটি শব্দকে ধরে নিয়ে এসেছে। এটাকে দিবারাত্র যদি ওলোট পালোট করা যায়, তাহলেই কাজ হয়ে যাবে।

সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠছে, মেঘে অদ্ভুত গুম্ গুম্ ধ্বনি হয়ে যাচ্ছে। এই ধ্বনিগুলোকেই মন্ত্র নামে অভিহিত করে সুরে আনা হলো। মন্ত্রটা কিভাবে দেবে? নিষ্ঠা সহকারে কাজের প্রচলন হলো। ঘুম থেকে উঠেই যদি বলা হয়, 'বউ, এটা কর, সেটা কর', করবে না হয়তো। কাজেই লক্ষ্মী পূজার আয়োজন করা হল। লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে শাশুড়ীর ভয়েই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, বাড়ী ঘর থেকে শুরু করে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে ক'দিন ধরে। একটা নিয়মে হাইজেনিক কাজ হয়ে যাচ্ছে, সামাজিক শৃঙ্খলাবোধও জেগে উঠেছে। এটাও ঠিক তাই। যে স্বরগ্রাম আছে, যেই সুরটা আছে, এই সা রে গা মা ওঃ ওঃ শব্দ ধ্বনি কানে দেয়। নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে গুরুপ্রদত্ত শব্দ ধ্বনি বারবার অন্তরে উচ্চারণ করতে হয়, সেটাই জপ। ওঁ এই শব্দ ধ্বনিকে বেদ প্রণব মন্ত্র রূপে অভিহিত করেছে। অনন্ত শব্দ ভান্ডার হতে এই একটি শব্দকে ধরে নিয়ে এসেছে। এটাকে দিবারাত্র যদি ওলোট পালোট করা যায়, তাহলেই কাজ হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবে বাচ্চারা যেমন ভাষা শেখে, বড় বড় প্রফেসর রাখবার দরকার হয় না, আপনা হতেই স্ফূরণ হয়, আমাদের মধ্যেও তেমনি আপনা হতেই স্ফূরণ হবে।

প্রণব মন্ত্র নামে যেটা অভিহিত হয়েছে, আমরা শ্বাসে প্রশ্বাসে অবিরত যদি সেই শব্দ সাধনা করে যাই, তাহলে সেই নাম স্বাভাবিকভাবে অন্তরে মিশে যাবে। আহার করলে যেমন রক্ত হয়, মাংস হয়, তারজন্য চিন্তা করতে হয় না, সিদ্ধি মুক্তি নির্বাণের জন্যও তখন আলাদা করে চিন্তা করতে হবে না। শিশুর মত অ আ ক খ যদি আমরা করে যাই, সেই স্বরগ্রাম যদি অনর্গল দিনরাত সাধনা করি, তবে এই অনন্ত বিশ্বের স্বরগ্রামের সুর এই সুরে এসে মিশবে। সেই শব্দ, যার কোন অর্থ নেই। তাই নিয়েই সাধনা করছি। কেন করছি, তাও জানি না। শূন্যকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সেই শব্দ দিয়ে যেন শূন্য স্থান পূর্ণ করতে চাইছি। সেই স্থান কোনদিন পূরণ হয় না। পূরণ হয় না বলেই হুঙ্কার ধ্বনি। সা সা রে রে করে যারা ওস্তাদ হয়েছে, এই আলাউদ্দিন, আপ্তাউদ্দিন ঢোল বাজাত বিয়া বাড়ীতে। আলাউদ্দিনকে

গোয়ালঘরে শুতে দিয়েছিল, তাতে মন খারাপ হয়ে যায়। অপমানে বেরিয়ে গিয়েছিল। আজ সে এশিয়ার সুর সম্রাট। রাজেন্দ্রপ্রসাদের (প্রেসিডেন্ট) ওখানে সম্মান পায়। সারাদিন শুধু আ আ করতো। আমরা অনর্গল যদি সেই সুর গেয়ে যাই, আমাদের হতে বাধ্য।

এই ধ্বনি, যে নাম নিয়ে মহাপ্রভু দিনরাত হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করতেন, সেই ১৬ নাম ৩২ অক্ষর নিয়ে তিনি আকাশপানে দুই বাহু তুলে রইলেন। চৈত্র মাসের রৌদ্রে ভক্তরা বলতো, 'যেও না পা পুড়ে যাবে, মরে যাবে'। তবুও যে সুর তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, সেই নাম করতে করতে, তিনিই কৃষ্ণ হয়ে গেলেন। আমরা বীজ। বীজ দেখলে বুঝা যায় না, এত বড় গাছ এর ভিতরে রয়েছে। আমরা বীজ আকারে আছি। এই বীজ পরিস্ফুট হবে। এই বীজ ফুল হয়ে ফুটবে। তাতে ফল ফলবে। নাদ ধ্বনির সেই সুর ফুটে উঠুক, গাছ হউক, ফুল ফল হোক। জেগে উঠুক মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান।

আমরা বীজ। বীজ দেখলে বুঝা যায় না, এত বড় গাছ এর ভিতরে রয়েছে। আমরা বীজ আকারে আছি। এই বীজ পরিস্ফুট হবে। এই বীজ ফুল হয়ে ফুটবে। তাতে ফল ফলবে। নাদ ধ্বনির সেই সুর ফুটে উঠুক, গাছ হউক, ফুল ফল হোক। জেগে উঠুক মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান। আগেই বলেছি, এই সুরটাকে নাদ ধ্বনি, প্রণব ধ্বনি নামে অভিহিত করেছে। এই সুরেতেই ভগবান আছেন কি নেই, কি আছে, কি নেই সব ধরা পড়বে। দিনের পর দিন সব মিটারের মত আমরা এগিয়ে চলেছি। সবাই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, সবাই যাবো আমরা।

এই জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরেই আমাকে হাজতে নিয়ে যাবে ব'লে একটা উড়ন্ত চিঠি এসেছে। এত বদনাম দিচ্ছে। যতো ঝড় আসুক, বাধা আসুক, তোমরা সাহায্য করো। যে অবস্থাই আসুক, রাস্তায় মাটি, মাটি হয়েই থাকে। আজ আমি ক্ষেতী হয়ে এসেছি। জগতের যে ঘোলাটে ভাব রয়েছে, এই ঘোলাটের ইঙ্গিত বহুদূর চলে যাবে। বলতে ইচ্ছা করলেও খুলে বলতে পারছি না। বহু বাধা আজ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। বহু বছর আগে বলেছিলাম, তিন শক্তি একত্রিত হবে। ক্রমশঃ ত্রিবেণীর মতন তিনটা দেশ মিলনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারজন্য ঝড় পোহাতে হবে। আর কিছু বলবো না। কিছু বলি আর পত্রিকাতে উঠবে। তোমাদের খুলে বলতাম। আমরা কোনদিকে যাচ্ছি, খুলে বলার দরকার নেই।

আমার অশান্তির জন্য আমি একটুও ঘাবড়াই না। আমার জেল হোক, ফাঁসি হোক, যাই হোক; যার জন্য এসেছি, দেশের শান্তির জন্য, বিশ্বের শান্তির জন্য যা করা দরকার, করবো। অনেক ঘাত প্রতিঘাত আসবে। তোমাদের অনেক বিদ্রুপ সহ্য করতে হবে। অনেকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে। তা করুক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নেমেছি, তা হতে বিচ্যুত হবো না। আমার লক্ষ লক্ষ শিষ্য আছে। বালক ব্রহ্মচারী রোজগার করতে চাইলে টাকা পেতে পারে অনেক। সে কাঠখোট্টা লোক, চুপ করে আছে। সে দেখছে এদের কান্ড কারখানা। সে কাউকে ছাড়বে না। এই দেশের মাটি, যেমন করে পারি, এক করে ছাড়বো। আমি গুরুগিরি করে ব্যবসা করতে আসিনি। আমি জন্ম থেকেই প্রকৃতির সুর, সেই আদি সুর নিয়ে এসেছি। বহু অপবাদ সহ্য করে যাচ্ছি। আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলছে। আমার সন্তানদেরও কিছু কিছু দুর্ভোগ পোহাতে হবে। যাক, এর সুরাহা করতে বেশীদিন লাগবে না। আজ সুভাষ বোসের নাম বলা আর বন্দেমাতরম্ বলা যে একই কথা, তারা (লালবাজার পুলিশরা) মানছে না। বড় বড় অফিসাররা আসছে, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, বলুন, সুভাষ বোস কোথায়? সুভাষ বোস কোথায় আছে যদি বলেন, আপনার নাম পত্রিকার ফার্ষ্ট পেজে (প্রথম পাতায়) বের হবে। আর যদি না বলেন, আপনাকে চোর, গুন্ডা, বদমাস ব'লে কেস (case) দিয়ে দেব।

আমার অশান্তির জন্য আমি একটুও ঘাবড়াই না। আমার জেল হোক, ফাঁসি হোক, যাই হোক; যার জন্য এসেছি, দেশের শান্তির জন্য, বিশ্বের শান্তির জন্য যা করা দরকার, করবো। অনেক ঘাত প্রতিঘাত আসবে। তোমাদের অনেক বিদ্রুপ সহ্য করতে হবে। অনেকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে। তা করুক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নেমেছি, তা হতে বিচ্যুত হবো না।

বহু অপবাদ সহ্য করে যাচ্ছি। আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলছে। আমার সন্তানদেরও কিছু কিছু দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

আমি বলি, যা খুশী করতে পারেন। আমি জানলেও বলবো না। সুভাষ বোস সম্বন্ধে জানবার এত কৌতুহল কেন?

— আপনি বলে দেন সুভাষ বোস কোথায়?

আবার একটু বলে ফেলেছি, আমি জানি বলবো না। একটা সত্য কথা কাঁহাতক ঘোরান যায়। আমার ধারণা তিনি আছেন। কতক্ষণ আর

আমার ধারণা তিনি আছেন। কতক্ষণ আর ধারণা ধারণা বলা যায়। আমার বিশ্বাস, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস তিনি আছেন।

ধারণা ধারণা বলা যায়। আমার বিশ্বাস, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস তিনি আছেন।

— আপনার বিশ্বাস, সে তো সাংঘাতিক কথা। সুভাষ বোসকে আনবার চেষ্টা করছেন?

— সুভাষ বোসকে আনবার চেষ্টা যদি করেই থাকি, তাতে ক্ষতি কি? তারা কিছুতেই আমাকে দিয়ে বলাতে পারলো না। এরজন্য কিছুদিন বাদেই দেখি, লালবাজারে আমার নামে অন্য কেস দিয়ে দিল। ১২ কাঠা জমি, ১,২০০ টাকা মূল্য, সেই কেস দিয়ে দিল। মাঝে মাঝে দুঃখে এসব বেরিয়ে যায়। সুভাষ বোস আছেন, আমার বিশ্বাস। এটা তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর, সেবিষয়ে কিছু বলছি না। আর এই দেশ ক্ষত আর থাকবে না। এই পাকিস্তান* যেটা রয়েছে, সেটা থাকবে না। আর ঘোলাটে যে অবস্থা, এই ঘোলাটের মাঝে কষ্ট সবারই সহ্য করতে হবে। একটু দুর্ভোগ পোহাতে হবে। আমরা কি করবো? কীর্তিনাশা জানো তো? আমাদের পদ্মার ধারে বাড়ী। একদিন নীচ থেকে দশ মাইল নিয়ে গেছে। ধুস্ করে একদিন পড়ে যায়।

আর এই দেশ ক্ষত আর থাকবে না। এই পাকিস্তান* যেটা রয়েছে, সেটা থাকবে না। আর ঘোলাটে যে অবস্থা, এই ঘোলাটের মাঝে কষ্ট সবারই সহ্য করতে হবে। একটু দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

জীবনের এই চলার পথে সবাইতো চলে যাচ্ছে। কারও গেছে বাবা, কারও গেছে ছেলে। আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে রয়েছি। তোমাদের সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে তোমাদের সাথেই আছি। আমাকে একটু জিজ্ঞাসা করে নিও। আন্ডার গ্রাউন্ডে কাজ করছি। তোমরাও একটু কাজ কর। যে কুমোর মূর্ত্তি গড়ায়, তার গায়ে কাদার ছিটা লাগবেই। সেই ছিটার ছিটেফোঁটা তোমাদের কাছেও আসবে।

ক্ষেত্র তোমাদের তৈরী। আর একটু পেটানো দরকার। কেবল লাঙ্গল দেওয়া হ'ল। তারপর দুরমুস করতে হয়। আরও বাকী আছে; হ'তে দাও। তোমরা ঠিক থাকবে। যখনই দেখবে। বদনাম হয়েছে। বুঝবে, তোমার প্রভু ঠিক আছে। যেদিন দেখবে প্রশংসা, তখন মনে করবে, কিছু গলদ আছে।

---

* পাকিস্তান! ১৯৭১ সালে এই পাকিস্তান টুকরো হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

কেউ যদি ঠাকুরের নামে বলে, তোমাদের ঠাকুর এই জমি মেরে দিয়েছে, তাহলে তাকে নমস্কার দেবে। বিনা খরচায় যদি এই প্রচার হয়, হাজার হাজার লোকের মাঝে ছড়িয়ে যায়, আমার পরিষ্কার করতে লাগবে, এক সেকেন্ড। ভাল প্রচার এক সেকেন্ডের। আমার ভাল নাম করতে এক সেকেন্ড লাগবে। তখন আর ঘরে ঘরে কুখ্যাত বালক ব্রহ্মচারীর নাম ২০/৩০ লক্ষ টাকা খরচ করেও করতে পারবে না। ক্ষেত্র তোমাদের তৈরী। আর একটু পেটানো দরকার। কেবল লাঙ্গল দেওয়া হ'ল। তারপর দুরমুস করতে হয়। আরও বাকী আছে; হ'তে দাও। তোমরা ঠিক থাকবে। যখনই দেখবে বদনাম হয়েছে বুঝবে, তোমার প্রভু ঠিক আছে। যেদিন দেখবে প্রশংসা, তখন মনে করবে, কিছু গলদ আছে। সৃষ্টির সময় মায়েদের নোংরা ঘাটতে লজ্জা হয় না। তোমরা দিন দিন পত্রিকায় নিন্দার খবর পাচ্ছ, দুঃখ পাচ্ছ। হ'তে দাও। আর একটু হবে। একটু খাটতে দাও, পরিশ্রম করতে দাও।

তোমরা আমায় কাজ করতে দাও। যে যা বলে, একটু হজম কর। আমি একটা চাবুক নিয়েছি। 'কড়া চাবুক' নামে একটা পত্রিকা বের হচ্ছে। ঢাকায় একটা 'চাবুক' পত্রিকা ছিল। সেটা কোনদিন কারও প্রশংসা করে নাই। সেটা আমারই প্রথম প্রশংসা করেছিল। ইঞ্জিন যখন হয়েছি, টেনে আমি নেবই। এই নাবালকের হাতে সম্পত্তি আমি আর রাখবো না। কারা নাবালক বলবো না। আমার তো লাখ লাখ শিষ্য। সেখানে নাবালকের মতও আছে। জয় তোমাদের অনিবার্য। জয়ের নিশানা নিয়ে ক্ষেতী হয়ে বিরাট শাশ্বত সুর নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি। জয় অনিবার্য। জয় হবেই। ডি.ডি.টি. দিলে আরশোলা মরে, তাই হচ্ছে। আমি চাই সকল দেশের নেতা যারা প্রসারতার বৃত্তি নিয়ে থাকবে, তারাই বন্ধু আমাদের। আর যারা তার বিরুদ্ধে, তারাই আমাদের শত্রু। তাদের জন্য কড়া চাবুক। আর বেশী কিছু বলবো না। এক্ষুণি চলে যাবো। এরপর অনেকে বলবে। কীর্তন হবে। তোমরা মন দিয়ে শুনবে। আজ এই থাক।

আমি চাই সকল দেশের নেতা যারা প্রসারতার বৃত্তি নিয়ে থাকবে, তারাই বন্ধু আমাদের। আর যারা তার বিরুদ্ধে, তারাই আমাদের শত্রু। তাদের জন্য কড়া চাবুক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ ৫২-তম জন্মতিথি

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট

১৮-১০-১৯৭১ (সকাল ১০-১৫ মিঃ থেকে ১০-৪৫মিঃ)

ঝড়ের বিরুদ্ধে এগিয়ে চল

আদি বেদবাণী ..... শ্লোক.....

একটু পরে সবাই hall-এ (university Institute Hall)যাবে। সেখানে ওরা আয়োজন করেছে। সেখানেই যা বলার বলবো। আজ কত বছর হলো। আজ থেকে ৫২ বছর আগে এমনি করে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত মেদিনীমন্ডলের গ্রামের বাড়ীতে পূজা হচ্ছিল। আমাদের বাড়ি বড় ছিল। সবাই বলতো বারো ভাইয়ের বাড়ী। সেইসব দিন আজ কোথায় চলে গেছে। আজ কোথায় এসে উপস্থিত হয়েছি। শরীর বিশেষ ভালো না। ঝড়ের বাতাসে কখন কাকে কোথায় নেয় বা নেবে, বলা মুস্কিল। তবুও যাতে ঝড়কে সামলিয়ে তোমরা চলতে পারো, সেদিকটা লক্ষ্য করবে এবং আমিও যতটা পারি, লক্ষ্য রাখছি। যে সম্পর্কে তোমরা গড়ে উঠছো, তোমাদের গড়া হচ্ছে এবং আরও গড়ার মুখে, এই সম্পর্ক যাতে অটুট থাকে, অক্ষুন্ন থাকে, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি কখনও

ঝড়ের বাতাসে কখন কাকে কোথায় নেয় বা নেবে, বলা মুস্কিল। তবুও যাতে ঝড়কে সামলিয়ে তোমরা চলতে পারো, সেদিকটা লক্ষ্য করবে এবং আমিও যতটা পারি, লক্ষ্য রাখছি।

কারও কথায়, কারও কানকথায় কারুর উপর মনঃক্ষুন্ন হয়ে, তার থেকে গা ঢাকা দিয়ে সরে থাকি না বা বিগড়িয়ে থাকি না। আমি কখনও তোমাদের থেকে সরে থাকবো না, এটা আমার নিজের কথা।

আমার কাছে কারুর নামে কেউ এসে কিছু বললেই আমি তা মেনে নিই না; জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। তোমরাও ঠিক সেইভাবে জীবনের গতিপথ চালিত করবে। কারণ অন্তর্যামিত্বহীন দেশ যেখানে, সেখানে কারুর মনের ভিতরে কি চলছে, কেউ সহজে ধরতে পারে না। যাই হোক, আমার সাথে তোমাদের যে যোগাযোগ, এই সূত্র এবং যোগাযোগ, শুধু এখানেই শেষ হয়ে যাক, সেটা আমি চাই না। চিরন্তন যেন এই যোগাযোগ থাকে। আমার যে এখানে আসা, আমার থাকা ও আমার কাজ এখানকার জন্য শুধু নয়। আমি এখানকার জন্য ভেবে কিছু করি না। আমি যাই করি না কেন, সেই ভবিষ্যতের কথা ভেবে করি। তাই এখানকার কাজে আমার অনেক সময় একটু ওলোট পালোট হয়ে যায়। ভবিষ্যতের ভাবনাটা যে আমি ভাবি, সেটা শুধু আমার জন্যই ভাবি না। তোমাদের সবাইকে নিয়েই ভাবি। ভাবনাটা তোমাদের সবারটা নিয়ে করি বলেই আমার আরও বেশী ঝড় ঝাপটা সহ্য করতে হয়। তাই কারও কান কথা শুনে বা কোন বার্তা নিয়ে এসে কেউ হয়তো আমাকে কিছু বললো, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। কারণ ঐ যে সুপ্ত-মেসেঞ্জার, ওরাই হল ভন্ডুল সৃষ্টি করার দূত। তারা তাদের কাজ শুরু করে দেয়। তারা তোমাদের ক্ষতির চিন্তায় সদা ব্যস্ত। তাই মেশামেশি করবে খুব সাবধানে।

তাই কারও কান কথা শুনে বা কোন বার্তা নিয়ে এসে কেউ হয়তো আমাকে কিছু বললো, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। কারণ ঐ যে সুপ্ত-মেসেঞ্জার, ওরাই হল ভন্ডুল সৃষ্টি করার দূত।

স্বচ্ছতায় ডুবে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার তত্ত্বের গভীরতায় ডুবে রয়েছে অহর্নিশ, সেরকম ব্যক্তি এখানে দুর্লভ। সেইরকম কারও সন্ধান পেলে তোমাদের লাভই হবে। কারণ বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বের অসীমতায় যাঁরা নিজেদের আত্মোৎসর্গ করে বসে আছেন, তাঁদের তেজের সামনে মেসেঞ্জাররাও আসতে ভয় পায়। কিন্তু এখানে বেশীরভাগ ব্যক্তি সেরকম নয়। ফলে মেসেঞ্জারদের কাজের সুবিধা হয়। তবে মেসেঞ্জারদের

সম্বন্ধে একটা কথা জেনে রাখবে, ওরা যতই ক্ষতিকারক হোক না কেন, ওদের ক্ষমতা তোমাদের থেকে অনেক কম। কারণ তোমাদের সহায় গুরু। তাছাড়া ওরা বিদেহী। তোমরা একাধারে বিদেহী, আবার দেহ নিয়েও বসে আছো। তাই তোমাদের অস্ত্র শস্ত্র সম্ভার, যুদ্ধে যা যা লাগে, তা ওদের থেকে অনেক বেশী। ওরা যতই বাধা দেবার চেষ্টা করুক না কেন, মনে রেখো, তুমি যদি তাতে সায় না দাও, ওরা কিছুই করতে পারবে না। তোমার জ্ঞান, তত্ত্ব, গুরুগতপ্রাণ ভাবনা, সবসময় আগুনের মত অন্তরে জ্বালিয়ে রেখে দেবে। মানুষ অসতর্ক মুহূর্ত্তেই ভুল করে বসে। না দেখে রাস্তা পার হতে গিয়ে উল্টে পড়লো। একটু যদি দেখে চলতো, তাহলে কি পড়তো? তাই তোমরা যদি তোমাদের অন্তরের গভীরতায় সদা সর্বদা তোমাদের গুরুকে, তোমাদের বুঝকে মশালের মতো জ্বালিয়ে রাখতে পারো, তাহলে দেখবে, বিশ্বের সব অশুভ শক্তিই তোমাদের কাছে পরাস্ত হয়ে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

আমার ইচ্ছা এই পৃথিবীতে যেমন তোমাদের সাথে বসে কথা বলছি, এই পার্ক ষ্ট্রীট বাড়ীতে যেমন, ঠিক সেইভাবে আর এক গ্রহে গিয়ে যেন এমনি করে কথা বলতে পারি। তা যাতে পূর্ণতা পায়, তাই আমার চেষ্টা। তোমাদের জ্ঞানচক্ষু যেদিন ফুটবে, সেদিন বুঝবে এই কাজ কতো কঠিন। হাজারটা সূর্য সৃষ্টি করাও এর থেকে অনেক সহজ কাজ। এটা একটু কল্পনার মতো, ভাবের মতো শোনালেও বাস্তব সত্য। একদিন সব প্রমাণে প্রমাণিত হবে। আজ নাহয় একটু রূপকথার মতো শোনাচ্ছে। কয়েকশো বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ যারা ছিল এই পৃথিবীর বুকে, তাদের কাছে ঐসময় যদি কোন বিচক্ষণ আজকের রেডিওর কথা বলতেন, তাহলে তারা হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু তোমাদের কাছে রেডিও আজ একটা জ্বলন্ত সত্য। ঠিক সেরকম আমার এই কথাগুলো, আজ থেকে হয়তো দেড়শো বছর পর যারা থাকবে, তাদের কাছে পরম সত্যের মতো লাগবে। কিছুদিন আগেও কেউ ভাবতে পেরেছিল, মানুষ চাঁদে যাবে? এই চাঁদে কেন, অন্যান্য

আমার ইচ্ছা এই পৃথিবীতে যেমন তোমাদের সাথে বসে কথা বলছি, এই পার্ক ষ্ট্রীট বাড়ীতে যেমন, ঠিক সেইভাবে আর এক গ্রহে গিয়ে যেন এমনি করে কথা বলতে পারি। তা যাতে পূর্ণতা পায়, তাই আমার চেষ্টা।

আমার এই কথাগুলো, আজ থেকে হয়তো দেড়শো বছর পর যারা থাকবে, তাদের কাছে পরম সত্যের মতো লাগবে।

অনেক গ্রহে যাতায়াতের কথা আমাদের আদিবেদে আছে। আমার কথাগুলোকেও তোমরা সেভাবে গ্রহণ কোর। কারণ যে যাই বলুক, ভুলে যেওনা তোমাদের ঠাকুর জন্ম থেকেই সবকিছু নিয়ে এসেছেন, এখানে এসে আমার কিছু করতে হয়নি।

জীবের ধর্মই পৃথিবীর পর পৃথিবী ঘোরা। এক পৃথিবীতে কেহ কখনও থাকে না, থাকতে পারে না। পৃথিবীর পর পৃথিবী ঘোরার এই যে চক্র, এই যে বারবার আসা যাওয়া, এর থেকে যাতে নিষ্কৃতি পেতে পার, চক্রের ফাঁদে যাতে আর না পড়ো, তারজন্যই আমার এত পরিশ্রম। ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে সেদিন আবার যাতে আমরা একত্রিত হতে পারি সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি। কারণ আজ হোক, কাল হোক যেতে হবেই। যেতে যখন হবেই, তখন সেই যাওয়ার কাজটাই তোমরা আমাকে করতে দাও। যারা সেখানে যেতে পেরেছে, তোমাদের ভাইবোনেরা, তারা আনন্দে বাস করছে; আর আমার আসার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই আনন্দের অংশীদার যাতে হতে পারো, সেই চেষ্টাই করবে। প্রত্যেকেই যা কাজ করে, এই যে অর্থ জমায়, ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। সেরকম আমিও তোমাদের পরম ও চরম ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কাজ করে যাচ্ছি। আমরা এক পরিবারের মতো হয়ে, একান্নভুক্ত পরিবার যেভাবে থাকে সেরকমভাবে যেন থাকতে পারি। সবাই যে মৃত্যুর সাথে সাথেই সেখানে যাবে, তা নয়। কেহ ২৫ বছর পরে, কেহ ৫০ বছর পরে যাবে। আবার এমনও থাকতে পারে, যাদের হয়তো শত বছর লাগবে। তবে যাবে যে, এটা সত্য। এই যে তিলু* চলে গেছে। তোমরা অনেকেই হয়তো তাকে চিনতে। তারপর প্রহ্লাদ সরকার চলে গেছে, এরা খুব খুব ভাল গেছে। তোমরাও যাতে

সবাই যে মৃত্যুর সাথে সাথেই সেখানে যাবে, তা নয়। কেহ ২৫ বছর পরে, কেহ ৫০ বছর পরে যাবে। আবার এমনও থাকতে পারে, যাদের হয়তো শত বছর লাগবে। তবে যাবে যে, এটা সত্য।

---

* তিলু ঃ- তিলোত্তমা বিশ্বাস, ঢাকার স্বামীবাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর ঘরোয়া বহু ভাষণে শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হিসাবে 'তিলু'র নাম উল্লেখ করেন। রাগ অভিমান কোনকিছুই ছিল না তার। শ্রীশ্রীঠাকুরের শত বকাবকিতেও বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হয়ে সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। তার মৃত্যু সংবাদ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্মশানে গিয়ে তার মৃতদেহে মাল্যদান করেন।

সেরকম যেতে পারো, তার পথ-ঘাট ভালো করে বুঝে নেবে, জেনে নেবে। শরীর অসুস্থ। গলা ধরে গেছে। বিকেলে কতোটা বলতে পারবো, জানি না। ডাক্তার তো কথা বলতে বারণ করেই দিয়েছে। শ্যামবাজার থেকে মা এসেছিল কালকে। আমার গলায় হাত বুলাতে বুলাতে কেঁদে ফেলেছে। আমিও বাচ্চা শিশুর মতো কেঁদে ফেলেছি।

একটাই কথা, যতো ভালবাসার জনই হোক না কেন, যে যাই বলবে, না জেনে গ্রহণ করবে না। এই মন নিয়ে যদি কিছুদিন চলতে পারো যে, আমি শোনা কথায় চলবো না। দেখবে, ভিতর থেকে একটা সুন্দর স্বচ্ছতার সৃষ্টি হচ্ছে। তখন আমার তত্ত্বটা বুঝতে সুবিধা হবে। ভালোবাসার জন বললো বলে আগেই বিশ্বাস করে বসো না, কথাটা মনে রেখো। এতে হয় কি, ভিতরের বিচারশক্তি যেটা আছে, সেটা আস্তে আস্তে ভীষণ পোক্ত হয়। যার ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক, গণিতভিত্তিক একটা মন তৈরী হয়ে যায়। এই মন তৈরী করতে না পারলে, এই বিশ্বের যে সূক্ষ্মতম গভীর তত্ত্ব, তা বুঝবে কি করে? যে পাত্রে লোহা গলে, যে পাত্রে টগবগ করে ফোটে, সেই পাত্রটা তো গলছে না। কারণ সেটা লোহার থেকে অনেক পোক্ত। তেমনি তোমাদের মনরূপ যে পাত্র, সেই পাত্রে যে বিশ্বতত্ত্বটা, গুরুতত্ত্বটাকে রাখতে হবে; পোক্ত না হলে কিভাবে সেটা ধারণ করবে? তাই আমার তত্ত্বের সুরটা এক একজন এক একরকমভাবে বোঝে, যার যার মাত্রা অনুযায়ী।

আমি তোমাদের সাথে মিশি তোমাদের ঘরের একজনের মতো হয়ে। তোমরাও সেইভাবে আমাকে দেখো। কোনদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাদের আলাদা করে আমি কোন চিন্তা করি নাই। ঘরে তো সবাই আমাকে রেখে দিয়েছো। ঘর থেকে তোমরা যেন সাড়া পাও এবং না পাওয়ার যখন কোন কারণ নেই, তখন তো ভাববার কিছু নেই। তোমরা ভরপুর হয়ে থেকো। আর জপ করবে; দেখবে সাড়া পাবেই। আর ভাইবোনেরা যারা আছো, নিজেদের মধ্যে এক গুরুর

ঘরে তো সবাই আমাকে রেখে দিয়েছো। ঘর থেকে তোমরা যেন সাড়া পাও এবং না পাওয়ার যখন কোন কারণ নেই, তখন তো ভাববার কিছু নেই। তোমরা ভরপুর হয়ে থেকো। আর জপ করবে; দেখবে সাড়া পাবেই।

শিষ্য যারা আছো, যাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি আছে, তারা সব ভুলে গিয়ে কোলাকুলি করে সব মিটিয়ে নিয়ে, আবার যেন একত্রে কাজ করতে পারো, সেটা দেখবে। সন্তানদলের ছেলেরা যথেষ্ট খাটছে। ওদের খাটার সুযোগ করে দেবে। সন্তানদলের সভ্য যাতে বাড়ে, সেটা দেখবে। আর চাঁদাটা নিয়ম করে দিও। কারণ ঐ চাঁদার পয়সাতেই 'কড়া চাবুক'টা ছাপানো হয়। পয়সা না পেলে ওরাই বা কিভাবে ছাপাবে বলো? প্রেসের খরচাটা যাতে উঠে আসে, সেটা দেখো।

তোমাদের কাজ বৃহৎ। তোমাদের মধ্যে যে বীজ দেওয়া হয়েছে, সেটা ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা করো। কয়েকজনের মধ্যেও যদি সেই সুরটা জেগে ওঠে, তাহলে দেখবে, অবাক হয়ে যাবে। শত শত জোনাকি দিয়েও একটা ছোট্ট গ্রামকে আলোকিত করা যায় না। কিন্তু থালার মতো একটা সূর্য, একটা গ্রাম কেন গোটা পৃথিবী, তার সাথে সাথে আরও কতো গ্রহে আলো দান করে যাচ্ছে। সেই সূর্যশক্তি তোমাদের মধ্যে রয়েছে বীজ আকারে। সেটা যাতে ফোটে, সেই চেষ্টা করো। এখানে জাতির সেবা, দেশের সেবা, এটা যেমন কাজ, তেমনি এই বীজকে ফুটিয়ে তোলাও তোমাদের কর্ত্তব্য। এটা আরও বড় কাজ।

শত শত জোনাকি দিয়েও একটা ছোট্ট গ্রামকে আলোকিত করা যায় না। কিন্তু থালার মতো একটা সূর্য, একটা গ্রাম কেন গোটা পৃথিবী, তার সাথে সাথে আরও কতো গ্রহে আলো দান করে যাচ্ছে।

যাক এখন আর বেশী কিছু বললাম না। Hall -এ ওরা আয়োজন করেছে, ওখানেই যাব। মামাকে (হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ) আসতে বলা হয়েছে। মামার মুখ থেকে তোমরা আমার ছোটবেলার কিছু কথা শুনতে পারবে। এখন এখানেই শেষ করছি। আমার জন্মদিনে তোমাদের কি দেব? গরীব বাবা পেয়েছো। আমি আজ আমাকেই তোমাদের কাছে সঁপে দিলাম। তোমরা এর মর্যাদা রক্ষা করে চলবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ ৫৭-তম জন্মতিথি

২২-১০-১৯৭৬

কর্মীরাই সমাজের স্তম্ভ

বেদমন্ত্র .....

আজ আমার জন্মতিথি। এই দিনটিকে কর্মীদিবসরূপে পালন করার জন্য তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি। এই 'কর্মীদিবস' কথাটি রাজনীতির কথা নয়। এই কথা অনন্ত বিশ্বের সুরের কথা। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু, বরুণ, এরা সবাই প্রকৃতির কর্মী। এরা দেশের সেবা করতেন, জাতির সেবা করতেন, বেদের সেবা করতেন। এঁদের উদারতা, এঁদের প্রসারতা দিয়েই আমাদের দেহ গড়া। এই পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম) মাধ্যমেই গড়া আমাদের দেহ, আমাদের মন। তবে আমাদের ভিতরে কেন এত হিংসা, এত দ্বেষ, এত নীচতা, এত রাগ, এত দলাদলি, এত ভেদ, এত সাম্প্রদায়িকতা? মহাকাশের মহা কর্মীদের মাঝে তো নেই কোন দলাদলি। আমরা সেভাবেই নিজেদের গড়তে চাই। মহাকাশের মহাস্বরগ্রাম তোমরা জান। এই স্বরগ্রাম তোমরা বাজাবে।

'কর্মীদিবস' কথাটি রাজনীতির কথা নয়। এই কথা অনন্ত বিশ্বের সুরের কথা। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু, বরুণ, এরা সবাই প্রকৃতির কর্মী। এরা দেশের সেবা করতেন, জাতির সেবা করতেন, বেদের সেবা করতেন।

তোমাদেরই পূর্বপুরুষ যাদের থেকে তোমরা তৈরী হয়েই এসেছ, যাদের থেকে তোমরা এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছ, সেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, তাঁরাই হলেন তোমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁদের কথা তোমাদের ভাবতে

হবে মনের দিক থেকে, অন্তরের দিক থেকে। সেইভাবেই নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। সমাজের অসুর দমন করে সমাজকে অভাবের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। আমরা খুন চাই না। আমরা কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাই না। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে সমাজকে গড়াতে চাই। আমরা কারও সাথে মারামারি করতে চাই না, যুদ্ধ করতে চাই না, দলাদলি করতে চাই না, কোন সাম্প্রদায়িকতায় যুক্ত হতে চাই না। যে মহানাম মহাস্বরগ্রাম 'রাম নারায়ণ রাম' তোমরা পেয়েছ, এই নাম তোমরা দ্বারে দ্বারে প্রচার করবে। এই নামের অর্থ তোমাদের অনেকদিন বলেছি। অনন্ত মহাকাশের যে অর্থ, এই মহানামেরও সেই একই অর্থ। বিরাট অর্থবোধে এই নাম।

এই 'রাম নারায়ণ রাম' এখানকার অর্থবোধে 'রাম নারায়ণ রাম' নয়। এখানকার যে রাম, নারায়ণ, সেটা ব্যক্তির নাম। সেখানে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। কিভাবে? মহাকাশের বর্ণনায় মহাকাশের গুণাবলী যাদের ভিতরে দেখা গেছে, তাদেরে সেই সেই নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাম বল, নারায়ণ বল, শিব বল, কৃষ্ণ বল এদের যে নামাকরণ, সব এইভাবেই করা হয়েছে। মহা আকাশের মহাশক্তির থেকে এক একটি নাম নেওয়া হয়েছে, এদের গুণের উপরে। তোমরা ব্যক্তির পূজারী নও, তোমরা ব্যাপ্তির পূজারী, মহাকাশের পূজারী, তোমরা বেদের পূজারী। তাই তোমরা এইভাবে কাজ করবে।

এক বিরাট সংগঠনের মাধ্যমে তোমরা কাজ করবে। এই সংগঠন হল তোমাদের সন্তানদল। এই সন্তানদল কোন রাজনীতি করে না, রাজনীতি জানে না। সেই সন্তানদলের কত বদনাম হয়েছে, কত অপবাদ দিয়েছে, তোমরা জান। সন্তানদল যে এতবড় একটা সংগঠনে পরিণত হবে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, এটা কেউ আশাই করতে পারেনি।

সবার সাথে সবাই একত্রিত হয়ে, এক সুরের বন্ধনে থেকে এক বিরাট সংগঠনের মাধ্যমে তোমরা কাজ করবে। এই সংগঠন হল তোমাদের সন্তানদল। এই সন্তানদল কোন রাজনীতি করে না, রাজনীতি জানে না। সেই সন্তানদলের কত বদনাম হয়েছে, কত অপবাদ দিয়েছে, তোমরা জান। সন্তানদল যে এতবড় একটা সংগঠনে পরিণত হবে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, এটা কেউ আশাই করতে পারেনি। কিন্তু দেখা গেল, সর্বত্র সর্ব জায়গায়

সন্তানদল ছড়িয়ে পড়েছে। আর রাম নারায়ণ রাম ঘরে ঘরে প্রচারিত হচ্ছে। সন্তানদল বেদ প্রচারক। আমরা রাজনীতি করি না। আমরা দেশের সেবা, জাতির সেবা করি। আমরা যখন কোন অন্যায় করছি না; আমরা বেদের প্রচার করছি। এখানে যে যা খুশী বলুক। আমরা যদি ত্রুটি না করি, আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। সত্যের উপর দাঁড়িয়ে, নিষ্ঠার উপর দাঁড়িয়ে আমরা বেদ প্রচার করে যাচ্ছি। এইভাবে তোমরা কাজ করে যাবে। আর এই নাম প্রচার করে যাবে। তাই আমার জন্মতিথিকে পালন করবে, কর্মীদিবস হিসাবে।

কর্ম যে করে সেই কর্মী। আমরা কর্মের পূজারী। কর্মই আমাদের ধর্ম। আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, সূর্য — প্রকৃতির সব মহান কর্মীরা সবাই সেবা করছে। এঁরা সবাই কর্মী। দেহের ভিতরে শত শত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, সবাই যার যার কাজ করে যাচ্ছে। সবাই কর্মী। অদ্ভুত একটা harmony-তে, নিয়মের সুরে বাঁধা আছে সকলে। জীবজগতে সবাই সবার কাজ করে যাচ্ছে। অনন্ত অণু পরমাণুগুলো যে যার কাজ আপনমনে করে যাচ্ছে। সবাই কর্মী। সুতরাং সব কর্মীদেরই আজ স্মরণ করবো। সব কর্মীদেরই আমাদের মনের ভিতরে এনে, তাদেরে স্মরণ করে, তাদেরে প্রণাম করে আমরা আমাদের কাজের ধারা স্থির করবো। তাই সন্তানদলের সব কর্মীরা একত্রিত হয়ে, সব কর্মীদের সাথে এক বন্ধনে থেকে, এক বিরাট আকারে আকার নিয়ে, এক যুক্ততায় এক যোগাযোগের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাবে। বৃহৎ চিন্তায় বৃহৎ উদ্দেশ্যে তোমরা বৃহৎ কাজ করে যাবে। এই কথা বহুবার বহু জায়গায় বহুভাবে বলেছি। কারণ অনেকেই ভুল বোঝে। এই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে আমরা থাকতে রাজী নই। যে যা খুশী করুক, যে যা খুশী বলুক, আমরা ঝড়ের বিরুদ্ধেই তরী ভাসিয়ে দিয়েছি। এইভাবেই আমরা কাজ করে যাব। শিশু বয়স থেকেই ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছি।

কর্ম যে করে সেই কর্মী। আমরা কর্মের পূজারী। কর্মই আমাদের ধর্ম। আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, সূর্য — প্রকৃতির সব মহান কর্মীরা সবাই সেবা করছে। এঁরা সবাই কর্মী। দেহের ভিতরে শত শত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, সবাই যার যার কাজ করে যাচ্ছে। সবাই কর্মী।

কিছুদিন আগে পত্রিকাতে challenge করেছি, ভারতবর্ষে সাধু,গুরু, মহান, অবতার, দেবতা যারা আছেন, তারা যদি সত্যি দেবতা হয়ে থাকেন, আসুন গড়ের মাঠে এক কমন (সাধারণ) জায়গায় জনগণের সম্মুখে এক যুদ্ধ হয়ে যাক। এই যুদ্ধে আমি চ্যালেঞ্জ (challenge) করেছি, আস ব্যাটা। তোমাদের চ্যালেঞ্জ আমিও নিচ্ছি। কোন আপত্তি নাই। হয় আমি থাকি, না হয় তুমি থাক। পরিষ্কার কথা। আরও বলেছি, আমার লক্ষ লক্ষ সন্তান, এক পয়সা কারও থেকে চাই নাই। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, হোম, যজ্ঞ এবং নানারকম আশ্রমের সুযোগ নিয়ে পয়সা উপার্জন করা অন্যায়। আমি আমার বাড়ীকে কখনও আশ্রম বলি না এবং নানারকম গুরুগিরির সুযোগ নিয়ে এক পয়সা রোজগার করি না। যদি কখনও এসব করে থাকি, আমাকে যেন গুলি করে মেরে ফেলে দেয়। কোন্ গুরুর এই হিম্মৎ আছে, বলুক তো দেখি। সবাইতো হোম করে, যজ্ঞ করে, বলতে গেলেই গলা টিপে ধরবে।

কিছুদিন আগে পত্রিকাতে challenge করেছি, ভারতবর্ষে সাধু,গুরু, মহান, অবতার, দেবতা যারা আছেন, তারা যদি সত্যি দেবতা হয়ে থাকেন, আসুন গড়ের মাঠে এক কমন (সাধারণ) জায়গায় জনগণের সম্মুখে এক যুদ্ধ হয়ে যাক।

আমার শিষ্যদের সাথে আমার এই রকম সম্পর্ক নয়। তোর শনির দশা আর তোর রাহুর দশা; তারজন্য যজ্ঞ করতে হবে, এই ধরণের সম্পর্ক নয়। আমার শিষ্যদের সাথে আমার অন্তরের সম্পর্ক; বাপ-ব্যাটার সম্পর্ক। আমি তাদের সাথে গালে গাল মিলাই, বুকে বুক মিলাই। তাদের বলি, 'আয় ব্যাটা, আমি তোর ঘরেরই একজন। দরকার হলে আমি পকেট থেকে টেনে নেব। তোর থাকলে আমাকে দিবি না কেন?' পরিষ্কার কথা। তারজন্য শনির দশা, রাহুর দশা যেদিন বলবো, ঠাস্ করে গুলি করে মেরে ফেলবি আমাকে। এই কথা দিয়েছি পেপারে (পত্রিকাতে) লিখে। কই, বাবাজীরা লিখুক দেখি। কোন আশ্রমের মোহন্তরা লিখুক দেখি, 'আমরা কোন যজ্ঞ করি না, হোম করি না, পূজা করি না, আশ্রমের জন্য টাকা নেই না,' লিখুক। তার পরের দিন শিষ্যরাই ঢিল মাইরা (মেরে) তারে সরাইয়া (সরিয়ে) দেবে। পারবে না।

দরকার হলে আমি পকেট থেকে টেনে নেব। তোর থাকলে আমাকে দিবি না কেন?' পরিষ্কার কথা। তারজন্য শনির দশা, রাহুর দশা যেদিন বলবো, ঠাস্ করে গুলি করে মেরে ফেলবি আমাকে।

আবার লিখেছি, দেখ, আমি সাধু, গুরু, ভগবান, অবতার সাজতে এখানে আসি নাই। আমি একজন জহুরী। আমি জহর চিনি। জহুরী ছিঁড়া জামাকাপড় পইরা (পরিধান করে) হাঁটতাছে। আমি একজন সাধারণ কর্মী। কিন্তু আমার কাছে একটা কষ্টিপাথর আছে। এই পাথরে ঘষা দিলে আসল আর নকল বেরিয়ে যাবে। আস ব্যাটা। কে আসবে আস। সব পরিষ্কার হইয়া যাবে। তাই কারও নাম ধরে আমি বলি নাই। ভারতবর্ষে বা অন্যত্র যে যেখানে আছে, আসুক। আমাকে বলুক। আমি চ্যালেঞ্জ (challenge) accept (গ্রহণ) করছি। আমি বাড়ীতে বইয়া challenge নিতে রাজী না। একেবারে খোলা মাঠে গিয়া সব দাঁড়াবো। আস, কে আসবা আস। কোমর বাইন্ধা (বেঁধে) বাবাজীগো সাথে লড়াই করবো। আমি মায়ের পেট থেকে পড়েই ঠাকুর হয়েছি। আমি তো গদীর ঠাকুর হইয়া জন্ম নেই নাই। আমি বাচ্চা বয়স থেকেই ঠাকুর। আমি চাই বেদের আদর্শে সমাজকে গড়তে। এরজন্য মারামারি, ফাটাফাটির দরকার নাই। পরিষ্কার কথা।

আমি মায়ের পেট থেকেই পড়েই ঠাকুর হয়েছি। আমি তো গদীর ঠাকুর হইয়া জন্ম নেই নাই। আমি বাচ্চা বয়স থেকেই ঠাকুর। আমি চাই বেদের আদর্শে সমাজকে গড়তে। এরজন্য মারামারি, ফাটাফাটির দরকার নাই। পরিষ্কার কথা।

আমি মূলাধার থেকে সহস্রারে দেহবীণাযন্ত্রের সুর বাজাই। মহা স্বরগ্রামের সুর বাজাই। বাজাতে বাজাতে মহাকাশের মহাধ্বনির সুর বাজাই। 'ভগবান আছেন', না 'ভগবান নাই', — এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নাই। যে যেখানে আছেন, মহাকাশে থাকুন। ভগবান থাকলেও তোমাগো (তোমাদের) কিছু না। না থাকলেও কিছু না। উনি তো আর কথাবার্তা কইতাছেন না তোমাগো সাথে। ওনার মনে উনি আছেন, থাকুন। আমরা একটা কাজ তো করবো। এই যে প্রকৃতির নিয়ম, ঋতুর পরিবর্তন, গাছ, ফুল, ফল, ফসল সবকিছু সুন্দরভাবে সাজানো, তার যে একটা সুর আছে, স্বরগ্রাম আছে, আমরা সেই স্বরগ্রাম বাজাবো। বেদমন্ত্র .....।

আমরা সেই সুর বাজাবো, যেই সুর বাজালে সব সুর জানা যায়। সুর নিয়া তো কোন ফাটাফাটি নাই। সব জাতিই এই সুরে আছে। সুরের একটা তাল আছে, মান আছে, মাত্রা আছে। তোমাদের দিয়েছি মহাকাশের

মহা স্বরগ্রাম, মহা সুর। ভগবান থাকলে এই পথ দিয়া নিজেই চইলা আসবে। তাঁর যদি দরকার থাকে, সুরের মাধ্যমে আইসা হাঁটা চলা করবে। আইসা (এসে) নিজেই তোমাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে। অযথা খোঁজাখুঁজির ঠেকাটা কি? তোমরা অযথা সময় নষ্ট ক'রো না। ভগবানকে অযথা খোঁজাখুঁজি করতে যেও না। বেদমন্ত্র .....।

দিবারাত্র এই নাম, মহানাম করবে, রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ রাম। এই মহানাম করার জন্য তোমাদের কাছে কি আসবে? শত বাধা, বিঘ্ন, বিপদ; যতরকম ঝড় ঝাপ্‌টা আছে, সব আসবে। কার্যক্ষেত্রে অপবাদ আসবে, অপপ্রচার হবে। তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলবে। যদি দেখ, খালি সুনামই হচ্ছে, সেখানেই ভয়। আর যদি দেখ, অপবাদ হচ্ছে, দুর্ণাম হচ্ছে, বাধা আসছে, তাহলে বুঝবে কাজটা হচ্ছে। তোমরা ভয় পাবে না। কেউ ভয় পাবে না। আমার সমস্ত জীবনটা ভরে অশান্তি, অপবাদ আর দুর্ণাম আসছে, বুঝলা? অপবাদ ছাড়া কোন কাজ নাই। শিশু বয়সে দুর্ণাম বেশী দিতে পারে নাই। তারপর যেই একটু বড় হইলাম, আশে পাশে এখনও তো আছে অনেকে, আরে বাপরে বাপরে বাপরে। কেমনে যে শাল দিব, সেই চিন্তায়ই অস্থির, বুঝছো?

শত বাধা, বিঘ্ন, বিপদ; যতরকম ঝড় ঝাপ্‌টা আছে, সব আসবে। কার্যক্ষেত্রে অপবাদ আসবে, অপপ্রচার হবে। তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলবে। যদি দেখ, খালি সুনামই হচ্ছে, সেখানেই ভয়। আর যদি দেখ, অপবাদ হচ্ছে, দুর্ণাম হচ্ছে, বাধা আসছে, তাহলে বুঝবে কাজটা হচ্ছে। তোমরা ভয় পাবে না।

যারা আমাদের পিছনে লাগছে, তারা ভুলে যায় যে, আমরাও পিছনে লাগতে পারি। আমরা সহজে চটি না। কারণ কারও পিছনে লাগতে ঘৃণাবোধ করি। আমরা যেখানে যাই, যে পাড়াতে যাই, এরকম কিছু কিছু থাকেন হিতাকাঙ্খী কেম্‌নে পিছনে লাগবে। একেবারে যতরকমে পারা যায় পিছনে লাগতে, বুঝতে পেরেছ? ভাল কথা। এদের স্বরূপ বুঝা যায়। এদের সাথে আবার যারা যোগ দেয়,

আমার সন্তানরা একেবারে জোয়ারের মত। ফুঃ দিলে উড়ে যাবে সব। কথার কথা বলছি। আমার সন্তানরা যদি ক্ষেপে যায়, তাহলেই কি সাংঘাতিক হয়ে যায়। কিন্তু আমরা সুতা ছাইড়া (ছেড়ে) দিই। দেখি, ঘুড়ি কতদূর উড়তে পারে।

তাদের স্বরূপও বুঝা যায়। আরে তিনদিনের যোগী, ভাতেরে কয় পান্তা। তিন পয়সার হিম্মৎ নাই। বড় বড় কথা। আমার সন্তানরা একেবারে জোয়ারের মত। ফুঃ দিলে উড়ে যাবে সব। কথার কথা বলছি। আমার সন্তানরা যদি ক্ষেপে যায়, তাহলেই কি সাংঘাতিক হয়ে যায়। কিন্তু আমরা সুতা ছাইড়া (ছেড়ে) দিই। দেখি, ঘুড়ি কতদূর উড়তে পারে। হেন বদনাম নাই, যে আমাকে না দিয়েছে। ডাকাতি, ছিনতাই, ওয়াগন ব্রেকার নামও জানতাম না। তারপর মেয়েলোকের বদনাম। কি রকম লোক, কি রকম বুদ্ধি, কি রকম মত নিয়ে যে চলে, এটাই আশ্চর্য।

আমরা কারও ক্ষতি করতে চাই না। আমরা বেদের পূজারী। প্রকৃতির বেদ নিয়ে থাকি। বেদ ছাড়া জানি না। যত বদনামই দিক, গঙ্গার স্রোতের মত নামের তরঙ্গে সব ভাসিয়ে দিয়েছি। আমি বাচ্চা বাচ্চা অনেক ছেলেমেয়ে মানুষ করেছি। আমার কাছে যখন আসে, তখন তাদের ৪/৫ বছর বয়েস। ১৫ বছর পরে তাদের ঊনিশ বছর, বিশ বছর বয়স হয়ে গেছে। এ্যাই? পারে তো কি যে বদনাম দেবে, দিশ পায় না। মেয়েগুলিও এমন, সতর্ক হয়ে গেছে। প্রণাম করেই এদিক ওদিক চলে যায়, দৌড় দিয়া পলাইয়া যায়। কি দুঃখের কথা। রাস্তায় কারও লগে দেখা হইলে, যদি গাড়ীতে নিয়া আসতে চাই, বলে, "না বাবা, আমাদের নিও না। তোমাকে বদনাম দেবে।" যারা এমন দেখে, তাদের চশমাটা মনে হয়, বাঁকা। কি দেখতে কি দেখে, ঠিক নাই। কার কি সম্পর্ক জানে না। আত্মীয়তা জানে না। জানে শুধু অপবাদ দিতে। আমরা কি নিয়ে বাস করছি, বোঝ। এদের স্বরূপটা জেনে রাখা দরকার।

আমার এখানে শ'দুই ছেলেমেয়ে থাকে। তাদের কাপড়—চোপড়, জামা, জুতা, সবই তো আমার ব্যবস্থা করতে হইতেছে। কেউ তো এগিয়ে আসে না। উপকার করার বেলায় কাউকে তো পাওয়া যায় না। তাহলে বুঝতাম। যে গরু দুধ দেয়, তার লাথি খাওয়াও ভাল। কিছুই করবি না। শুধু বইসা বইসা গুলতানি। এই নিয়া বাস করছি এখন। সকলেই এমন না। কয়েকজন আছে; এদের স্বরূপটা

বড্ড বেড়ে যাচ্ছে। বেড়ে গেছে। একটার পর একটা অশান্তি করেই চলেছে। কাঁহাতক সহ্য করা যায়। সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কত সহ্য করবো?

তোমাদের জেনে রাখা উচিত। নাম বলবো না। কারণ এইসব উপদ্রব সমাজের বুকে দুষ্ট ক্ষতের মত রয়েছে। তাদের সংশোধন হওয়া দরকার। বড্ড বেড়ে যাচ্ছে। বেড়ে গেছে। একটার পর একটা অশান্তি করেই চলেছে। কাঁহাতক সহ্য করা যায়। সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কত সহ্য করবো? আমি না হয় বসে বসে মার খেলাম। কথা হল, আমার বালবাচ্চাগুলি যারা আছে, তারা সহ্য করবে কতক্ষণ? তারপর আরেক অশান্তি। কে কোথায় কাকে মারলো? লক্ষ লক্ষ সন্তানের মধ্যে কে কোথায় কি করলো। এই তো ঠাকুরের লোক মারলো। সব আমাকে পোহাতে হবে। বহু সন্তানের বাপের অনেক ছিদ্যৎ। আমাকেও অনেক কিছু পোহাতে হচ্ছে। একেকজন একেক জায়গায় ঝঞ্ঝাট করবে আর আমাকে পোহাতে হবে।

তোমরা কাজ করে যাবে। একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে যাও। নামের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাও। তোমরা C.I.A.-র এজেন্ট নও। C.I.A.-র টাকায় চল না। তোমরা উপার্জন করে সত্যিকারের যতটুকুনু পাও, তা দিয়েই চল। আমরা তাই দিয়েই সেভাবেই চলি। তোমরা সুন্দরভাবে যতটা পার, কাজ করবে। আর আমি তো তোমাদের ঘরের একজনের মত থাকি সব সময়। তোমাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসি। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে সব সময় তোমাদের পাশে থাকি, টেনে রাখি। তোমরা সেই ভাবে কাজকর্মগুলি কর। জায়গায় জায়গায় শাখা বাড়াবার চেষ্টা কর। শাখায় শাখায় নিজেদের মধ্যে আর ঝগড়া বিবাদ করো না। এই যে, এই ঝগড়া সেই ঝগড়া, 'এ' একথা বললো, 'ও' সেকথা বললো, এগুলো আর করো না। এগুলির আর দরকার নাই। আজ থেকে তোমাদের নাম হল হরিজন। এই যে লাল পাগড়ী বাঁধা, এদিকে এস। এই দেখ, হরিজন এই দেখ। লাল হচ্ছে ভালবাসার প্রতীক। কম্যুনিষ্টদের লাল নয়। ছোটবেলা ৫/৭ বছর বয়সে আমি গেরুয়া পরতাম। এটা কালা (ময়লা) হলেও বেশী বুঝা যায় না। সাদা তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায়। সাবান কিনতে পয়সা লাগে তো। তোমরা হরিজন হয়ে কাজ করবে।

জায়গায় জায়গায় শাখা বাড়াবার চেষ্টা কর। শাখায় শাখায় নিজেদের মধ্যে আর ঝগড়া বিবাদ করো না। এই যে, এই ঝগড়া সেই ঝগড়া, 'এ' একথা বললো, 'ও' সেকথা বললো, এগুলো আর করো না। এগুলির আর দরকার নাই। আজ থেকে তোমাদের নাম হল হরিজন।

এই দেখ, আমার ছেলেরা, তোমাদের ভাইয়েরা কেউ ছুতার মিস্ত্রি, কেউ পাম্প মিস্ত্রি, কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি,কেউ গাড়ীর মিস্ত্রি। সব আছে আমার কাছে। সবাই সব জানে। এদের মধ্যে ছুতার মিস্ত্রি প্রধান। আমার এখানে দেখ, Double M.a., Triple M.A., Doctorate, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার সবই আছে। আবার দেখা যায়, ধাঙ্গরের কাজ, মেথরের কাজ সবাই করতাছে। আমরা সেইভাবেই কাজ করতে চাই। আমিও ইট ভাঙতে চাই, রাজমিস্ত্রি হতে চাই। সবার সঙ্গে কাজ করতে চাই। ছুতারমিস্ত্রি হতে চাই। নিজেদের কাজ নিজেরা করে আমরা সেইভাবেই চলতে চাই।

আমরা চাষী তো। আমার বাপ-ঠাকুর্দা পন্ডিত হলে কি হবে, ক্ষেতে গিয়ে লাঙ্গল ধরে চাষ করেছেন। তাঁরা চাষবাস করেন, কাজকর্ম করেন, বিদ্যাচর্চা করেন। আমার ছেলেরা হাতুড়ি, বাটালি নিয়ে কাজকর্ম সব জানে। এরা সব জানে। সব কাজ জানে। কর্মীদিবস তো, গাড়ীর ড্রাইভার থেকে আরম্ভ করে সব আছে। যার যার হাতের কাজ করে যাচ্ছে। এরা লেখাপড়া জানে।

এরা সব জানে। সব কাজ জানে। কর্মীদিবস তো, গাড়ীর ড্রাইভার থেকে আরম্ভ করে সব আছে। যার যার হাতের কাজ করে যাচ্ছে। এরা লেখাপড়া জানে।

রবীন* কোথায়, রবীন (আবাসিক)? এই যে দেখ, শুকনো মানুষটি দেখাচ্ছি। বশিষ্ঠ মুনি থাকলে, বুঝতে পারতে এই মুনি কি? শুকনো মানুষটি। শুকনো না। ভীষণ তেজ আছে। আবার ভালবাসাও আছে। এর হাতে ভার দিয়েছি, তুমি এইসব কাজ করাও এবং গুছাও।

এই যে দেখছো, একটি স্তম্ভের উপরে রামধনু। রামধনুর সাতটি রঙ ঠিকরে বেরোচ্ছে। এটি হল symbol, প্রতীক চিহ্ন। কর্মীরাই হ'ল সমাজের স্তম্ভ। স্তম্ভ (শ্রমিক বা কর্মীরাই) সমাজকে ধরে রেখেছে। সূর্যের যে সাতটা

---

* রবীন ঃ- (রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) আইনজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি প্রশান্ত মহলানবীশের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত হয়ে তাঁর সাথে সাথে বহুবছর অতিবাহিত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিনি অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। বহু দুরূহ সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তিনি এগিয়ে আসতেন।

স্তম্ভ (শ্রমিক বা কর্মীরাই) সমাজকে ধরে রেখেছে। সূর্যের যে সাতটা রঙ বেরিয়েছে, সূর্যদেব বিভিন্ন কিরণের মাধ্যমে, রূপের মাধ্যমে সপ্তরঙের প্রকাশ করছেন।

রঙ বেরিয়েছে, সূর্যদেব বিভিন্ন কিরণের মাধ্যমে, রূপের মাধ্যমে সপ্তরঙের প্রকাশ করছেন। সূর্যের এই সাতটি রঙের, এই সপ্তরঙের বিকাশ, প্রকাশকে সৃষ্টিতত্ত্বের মূলতত্ত্ব হিসাবে, ধ্বনি হিসাবে, স্বরগ্রাম হিসাবে বলা হয়েছে এবং এই রামধনুকে আমরা তার symbol হিসাবে ব্যবহার করছি। সুতরাং রামধনুকে নীচে স্তম্ভ স্বরূপ তার কর্মীরা ধরে রেখেছে। আর সূর্যদেব বিভিন্ন সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন রূপের খেলা খেলছেন। এই রঙই হচ্ছে সুর। একটা রঙের (সুরের) সঙ্গে আর একটা রঙ (সুর) বনে (মেলে)? একটা চেহারার সঙ্গে আরেকটা চেহারা বনে? সাতটি রঙের খেলা; সপ্ত সুরের খেলা। এটাই হচ্ছে সপ্তরঙ, সপ্তর্ষি। জানতো, এই সপ্তরঙের symbol হচ্ছে কর্মীদিবস। মানে হল, আমার জন্মদিনে, আমার জন্মতিথিকে কর্মীদিবসরূপে পালন করলে, জন্মদিবস পালন সব থেকে ভাল হবে। কর্মীরা তোমাদের কর্ম ক্ষমতায় তোমরা যতটা পার, কাজ করে যাবে। কর্মের যে আদর্শ, বেদের যে আদর্শ, প্রকৃতির যে আদর্শ, সেই আদর্শের পূজা (সেবা) করলেই গুরুপূজা (গুরুসেবা) হয়ে যায়। সেই সেবাই তোমরা করবে। সেইভাবেই তোমরা চলবে।

একটা চেহারার সঙ্গে আরেকটা চেহারা বনে? সাতটি রঙের খেলা; সপ্ত সুরের খেলা। এটাই হচ্ছে সপ্তরঙ, সপ্তর্ষি। জানতো, এই সপ্তরঙের symbol হচ্ছে কর্মীদিবস।

কত দূর দূর থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছে আমার কাছে। এই যে দেখ, একটি ভাই তোমাদের। বাঁশী কিনতে অনেক পয়সা লাগে। পয়সা কোথায় পাবে, কিভাবে বাঁশী বাজাবে? গরীব বাজনদার, সে সবসময় গাছে গাছে সুর খোঁজে, লতায় পাতায় সুর দেখে। এইভাবে দেখতে দেখতে, সুর খুঁজতে খুঁজতে আমপাতা, জামপাতা, কাঁঠালপাতায় সুর খুঁজে পেল। একটু বাজাও তো। এই যে জামপাতায় সুর বাজাচ্ছে। অপূর্ব সুন্দর সে সুর বাজনা।

আমরা হলাম সেইরকম। আমরা সুরের পথিক। সুর খুঁজতে খুঁজতে যদি গাছে লতায় পাতায় সুর খুঁজে পাওয়া যায়, আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। তোমরা এইভাবেই চলবে। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ ৬০ তম জন্মতিথি

টালাপার্ক

২০-১০-৭৯

বেদমন্ত্র .....

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে দেশের সন্তানেরা এই বেদের সুর নিয়ে সমাজকে কিভাবে সুন্দর করে গড়ে তুলেছিল, জানলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তখন সেখানে বিবাদ-বিচ্ছেদের কোন গন্ধ ছিল না। তাই দেশের সন্তানেরা সব দলে দলে বেড়িয়ে পড়েছিল দেহের মাঝে সপ্তচক্রের, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত; বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারের স্বরগ্রাম নিয়ে, অর্থাৎ সপ্তচক্রের সা রে গা মা পা ধা নি সা নিয়ে। স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হলে কি পাবে? স্বাধিষ্ঠানে হয় সৃষ্টি, ইহা জীবনের যাত্রার পথে এতটুকুনু তৃপ্তি মাত্র। এই তৃপ্তিটুকুর জন্য, এখানকার এই ক্ষনিকের তৃপ্তির জন্য দেখ, কত মারামারি, কাটাকাটি, ফাটাফাটি হয়ে যাচ্ছে। মহাকাশের মহার্ণবের বিরাট তৃপ্তির এতটুকুনু অংশমাত্র, নমুনামাত্র মেলে এই স্বাধিষ্ঠানে।

মনিপুর ..... বেদমন্ত্র। মনিপুর হচ্ছে নাভি। মাতৃজঠরে ভ্রূণাবস্থায় নাভিমূলের মূলগ্রন্থি থাকে জননীর সাথে একই যোগাযোগের যোগসূত্রে গাঁথা। যখন জন্ম হবে, এই নাভিই তখন সেবা করছে, আহার করাচ্ছে। তাই তখন এইভাবে কচ্ছপের আকারে, কূর্মাকারে থাকতে উদরে। তারপর

তুলা থেকে যেমন সুতা বের হয়, আর সুতা থেকে বিভিন্ন রকমের কাপড় বস্ত্রাদি তৈরী হতে থাকে, তেমনিভাবে ওঁয়া থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ভাষা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

যখন জন্ম নিলে তখনই শুরু হয়ে গেল ওঁয়া ওঁয়া। আদি মহামন্ত্রের সুর, একজাতি একনীতি, একভাষার সুর ওঁয়া ওঁয়া। ক্রমে ক্রমে ওঁয়া থেকে বিভিন্ন সুর, বিভিন্ন ভাষা বের হতে আরম্ভ করলো। একেক দেশের একেক সুরে একেক ভাষা উৎপন্ন হলো এই ওঁয়া থেকেই। তুলা থেকে যেমন সুতা বের হয়, আর সুতা থেকে বিভিন্ন রকমের কাপড়, বস্ত্রাদি তৈরী হতে থাকে, তেমনিভাবে ওঁয়া থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ভাষা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

সেইসময় দেশের সন্তানেরা বাকল (গাছের ছাল) পরতো। বাকল পরে তারা দেশের সেবা করতো। সেই বাকলে পকেট ছিল না। আর এখন বাকল (পোষাক) যারা পরছে, তাদের পকেট হয়ে গেছে অনেক। এই পকেট হয়ে যাওয়ার ফলে এমনই হয়েছে যে, পকেটভারী না করলে কোন কাজ হয় না। আজকে দেশের সন্তানরা পকেটভারীর চিন্তায় ব্যস্ত। বুঝতে পেরেছ? তাই তখনকার সময়ে সন্তানরা বাকলই পরতো। আর বাকলের কোন পকেট ছিল না।

আমার বিশেষ অনুরোধ, এখানে I.B., D.I.B. পুলিশ ভাইরা যারা উপস্থিত আছেন, আমার কথার অর্থ বুঝে নিয়ে তারা যেন রিপোর্ট দান করেন। এটা আমার বিশেষ অনুরোধ। তার কারণ রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়াইয়া ঐ সমস্ত খেলাঘরের খেলা এই বাচ্চা ঠাকুর করেন না। আমি ঘৃণাবোধ করি। ঐ সমস্ত কাজ রাজনীতির গুলি খেলা। ভুলে যেও না, আমি কোটি কোটি লোকের ঠাকুর। এই ঠাকুর যা বলেন, রাজনীতির মত মনে হলেও রাজনীতির কথা নয়। এটা বেদনীতি, বেঁচে থাকার নীতি, বাঁচার নীতি, বাঁচাবার নীতি। সুতরাং পুলিশ ভাইদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, তাদের কর্ত্তব্য তারা করবেন, নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু এমন কোন রিপোর্ট দেবেন না যে, ঠাকুর এমন কথা বলেছেন, যেটা সন্দেহজনক। আমার বিরুদ্ধে মেয়েলোকের কেস, ডাকাতির কেস, ছিনতাইয়ের কেস থেকে শুরু করে হাজার হাজার কেস দিয়েছে। আমি যুদ্ধ করেছি। হয় ফাঁস, নয় খালাস। কাউকে তোয়াজ করতে যাইনি, ভুলে যাবে না। সুতরাং সেই বাচ্চা বয়সের ঠাকুর আজ লক্ষ লক্ষ, আড়াই কোটি, তিনকোটি লোকের ঠাকুর

ভুলে যাবে না। কার হিম্মৎ আছে প্রকাশ্য দিবালোকে, জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলতে পারে? সুতরাং আমার কোটি কোটি সন্তান গুরুগিরির জন্য নয়, ভগবান সাজবার জন্য নয়। অবতার সাজবার জন্যও নয়। এই আড়াই কোটি, তিন কোটি সন্তানকে ধারাল করে গড়ে তুলতে গিয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে শিকার শেখাচ্ছি, কিভাবে আমাদের মত শয়তানদের আক্রমণ করতে হবে, বিতাড়িত করতে হবে। তারা শিখে নিচ্ছে ধর্মের নামে শোষণকারী সমাজের পরগাছাস্বরূপ এইসব বেশীরভাগ সাধুগুরুদের কিভাবে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে সমাজকে স্বচ্ছ পবিত্র করতে হবে।

আমি আমার সন্তানদের বলেছি, যেদিন দেখবি, গুরুগিরি করে পয়সা রোজগার করছি, হোম, যাগযজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে অর্থ উপার্জন করছি, সোজাসুজি গুলি করবি আমাকে। কোন্ বাপ সন্তানদের একথা বলতে পারে যে, যদি আমি আগাছা হয়ে, পরগাছা হয়ে ধর্মের নামে তোদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করি, গুলি করবি আমাকে? আজ আমার আড়াই কোটি, তিন কোটি সন্তান। কারও কাছ থেকে আজ পর্যন্ত পূজা পার্বন, যাগ-যজ্ঞের সুযোগ নিয়ে, এসবের নাম নিয়ে একটি পয়সাও সংগ্রহ করিনি। বদনাম নিয়েছি অনেক। জমি মারার কেস, ডাকাতির কেস, ছিনতাইয়ের কেস, কোনটা বাদ নাই। তাই প্রফুল্ল সেনকে বলেছি, 'কি, আপনিতো আমাকে বলেছিলেন বিধবার সম্পত্তি মেরেছি।'

আমি আমার সন্তানদের বলেছি, যেদিন দেখবি, গুরুগিরি করে পয়সা রোজগার করছি, হোম, যাগযজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে অর্থ উপার্জন করছি, সোজাসুজি গুলি করবি আমাকে।

প্রফুল্ল সেন বলে, 'আর বলবেন না। ভুল করেছি অন্যায় করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

দূর। যাক্ সেকথা। যে কথা বলছি, পুলিশ ভাইরা তো আমারই দেশের সন্তান। আমাদের দেশের সন্তানদের সাথে তারা যেন ব্রিটিশের মত ব্যবহার না করেন। শাসকদলে যারা আছেন, তারা যেন ব্রিটিশের মত

আমাদের ওপর অযথা অত্যাচার অবিচার না করেন। বড়ই দুঃখের কথা। একটা ভাল কাজ করতে পারবো না, প্রতিমুহূর্ত্তে বাধা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবো না, একটা ভাল কথা বলতে পারবো না, বলবে রাজনীতির কথা বলছি।

আমি রাজনীতির কথা বলছি না। যাই হোক, যে উদ্দেশ্যে আমি আজ সমাজের বুকে এগিয়ে আসছি, সেটা হল, অবতার সাজবার জন্য নয়, ভগবান সাজবার জন্য নয়। আমি আসছি দেশের সন্তানদের কর্মী হয়ে দেশের সেবা করতে। আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিনের আনন্দ আমার নেই। সেদিন হবে আনন্দ, যেদিন দেশের সমস্ত মা বোনেদের মুখে হাসি ফুটবে; সেদিন করবো জন্মদিন। আজ আসছি শোকের দিন নিয়ে। আজ শোকদিবস পালন করতে এসেছি। কর্মীদিবস পালন করতে এসেছি। আমাদের আবার কিসের জন্মদিন? যেই দেশের লোকের খাওয়া জোটে না, পরা জোটে না; অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, আশ্রয় নাই। যেই দেশের মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, তাদের আবার ইজ্জৎ, তাদের আবার রাজনীতি। শুধু বড় বড় কথা। ছেড়ে দাও ওসব। আজ সরকার private limited হয়ে গেছে। তাদের এটা বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষের সম্পত্তি নয়। ইচ্ছেমত যা খুশী তাই অত্যাচার অবিচার চালিয়ে যাবে, আর আমরা মাথা পেতে সহ্য করবো, চুপ করে থাকবো, সেটা হতে পারে না। আমরা সহ্য করবো না।

আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিনের আনন্দ আমার নেই। সেদিন হবে আনন্দ, যেদিন দেশের সমস্ত মা বোনেদের মুখে হাসি ফুটবে; সেদিন করবো জন্মদিন। আজ আসছি শোকের দিন নিয়ে। আজ শোকদিবস পালন করতে এসেছি। কর্মীদিবস পালন করতে এসেছি।

আমরা ভাল করতে চাই, ভাল দেখতে চাই, ভালোর সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চাই। কিন্তু যে অপরাধের ঢেউ আমাদের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে, সেই অপরাধের বিচার কে করবে? তদন্ত করেই শেষ হয়ে যাবে? ঐ তদন্তের রিপোর্ট আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা চাই বিচার। আমরা আইন হাতে নিতে চাই না। এইভাবে সমাজ চলতে পারে

না। তাই আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সন্তান দলে দলে বেরিয়ে পড়বো। আর কিছুর জন্য নয়। আমরা গদী চাই না, রাজনীতি করতে চাই না। দেশের মা বোনেদের মুখে দুটো অন্নের জোগাড় হোক, তারা খেয়ে বাঁচুক, তার ব্যবস্থার জন্য আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বার ব্যবস্থা করছি। দেখি, কে আমাদের বাধা দেয়। অনেক পার্টির লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে আজেবাজে সমালোচনা করছে এবং যা খুশী তাই বলে বেড়াচ্ছে। আমরা নাকি C.I.A.-র এজেন্ট। তারা অন্যান্য পার্টির সাথে আমাদের মিলাবার চেষ্টা করছে। আমরা C.I.A.-র Agent নই। আমরা সরকারের বিরোধিতা করি না। আমরা রাজনীতি করি না। আমরা কারও বিরুদ্ধে সমালোচনা করি না। কোন পার্টির বিরুদ্ধে আমরা আলোচনা, সমালোচনা করি না। কারও বিপক্ষতা করিনা। একথা যেন তারা মনে রাখেন।

আমাদের সন্তানদল, দল হিসাবে দল নয়। সন্তানদল হচ্ছে সন্তানবৃন্দ, সন্তানগন। শুধু তারজন্য আমাদের বিরুদ্ধে শাখায় শাখায় বহু অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে কিছুসংখ্যক পার্টির ব্যক্তিরা। তারা মনে করেছেন, এক মাঘে জার (শীত) যাবে। তারা মনে করেছেন, এই ভাবেই চলবে? এই বুঝি তাদের শেষ কথা? কিন্তু তারপরেও আমাদের ধৈর্য সহ্যের বাঁধ দিয়ে চলেছি। সবাইকে হুঁশিয়ার করতে হবে। সাবধানে চলতে হবে। এইভাবে দিন চলতে পারে না। দিনের পর দিন অত্যাচারের পর অত্যাচার চলছে। আজ ৩০টা বছর স্বাধীনতা পাওয়া অবধি একভাবে হিমসিম খেয়ে চলছি আমরা। কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা সববিষয়ে সুবন্দোবস্ত চাই।

আমি শুধু ধর্মের কথা বলবো না। আমি সেই ধর্মের কথা বলবো না। আমি পাপ পুণ্যের কথা, স্বর্গ নরকের কথা বলবো না। যেই দেশের ভগবানকে ডেকে ক্ষুধা মেটে না, ভিক্ষুকের সমাধান হয় না, সেই ভগবানের কথা উচ্চারণ করবো না। আমি সেই ভগবানের কথা বলবো, যেই ভগবানের কথা বললে সব সমস্যার সমাধান হয়। ধর্ম সমাজকে ধরে রাখার কথা বলে। ধর্ম সমাজে ভিক্ষুক

আমি শুধু ধর্মের কথা বলবো না। আমি সেই ধর্মের কথা বলবো না। আমি পাপ পুণ্যের কথা, স্বর্গ নরকের কথা বলবো না। যেই দেশের ভগবানকে ডেকে ক্ষুধা মেটে না, ভিক্ষুকের সমাধান হয় না, সেই ভগবানের কথা উচ্চারণ করবো না।

তৈরী করার কথা বলতে পারে না। সুতরাং আমরা সেই ধর্মের কথা বলবো, যেই ধর্ম সমাজকে রক্ষা করবে। সুতরাং আজকের ধর্ম সমাজকে রক্ষা করছে না। আজকের ধর্ম সমাজে বাবাজী তৈরী করছে, গদানন্দ, সদানন্দ তৈরী করছে। তারা বেশীরভাগই একভাবের আনন্দে আছে। তারাই আজকের সমাজে পরগাছা হয়ে নিরীহ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যাচ্ছে। আমি তো লেংটি পরে আছি। লেংটির কোন পকেট নাই। সমাজে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মের নামে চলছে ঠগবাজির চূড়ান্ত খেলা। আমি যদি শনি আর রাহুর ব্যবসা শুরু করি, মাসে কয়েক কোটি টাকা রোজগার করতে পারি। শুধু শনি আর রাহু। তারপর আছে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন। আমার হাত কেটে ফেলবো ঐসব করলে। সুতরাং তোমাদের কাছে একথাই বলছি, তোমরা প্রস্তুত হও। প্রস্তুতি নাও মনের দিক থেকে। কারও ক্ষতির চিন্তা করবে না। খুনখারাপি আমাদের কর্ম নয়। আমরা এগিয়ে যাওয়ার পথিক। আমরা কাউকে আঘাত করবো না। কিন্তু আমাদের ঘরে যদি ডাকাত আসে, সেই ডাকাতকে ফুল চন্দন, দুর্বা দিয়ে পূজাও করবো না।

আজ দীপান্বিতা। হিন্দুশাস্ত্রে মায়ের পূজা। কেমন মা? ল্যাংটা চ্যাংটা হইয়া, জিহ্বা টিহ্বা বাইর কইরা হুড়মুড় কইরা আইসা পড়ছে। আরে বাপরে বাপ। ব্যাপার কি? মা, তোমার কি হয়েছে?

— আমার কিছু হয় নাই। তগো (তোদের) দেখলে রাগ হয়।

— কেন মা?

— কিছুদিন আগে আসলাম ঢাল, তলোয়ার নিয়ে, দশহাতে দশ অস্ত্র নিয়ে। আর তোরা কি করলি? দুর্গা মাইকি জয়।' কোন কাজ তরা (তোরা) করলি না। তারপর লক্ষ্মীরে পাঠাইলাম, 'দ্যাখ তো, কিছু কাজ করে কি না।'

লক্ষ্মী চুপচাপ আইসা কইল, যে কে সেই। কোন কাজ করবে না। কিছু করছে না, লক্ষ্মী আইসা রিপোর্ট দিল।

তারপর আমি (মা) নিজে আবার আসলাম। একেবারে উলঙ্গিনী। রক্ত টক্ত বাইর কইরা একেবারে কি অবস্থা। আমি এইবার তগো নাচ দেখাইতে আইছি। তোরা তো নাচ দেখতে ভালবাসোস্।

লজ্জার কথা। মা নাচ দেখাতে আসছেন সন্তানদের; উলঙ্গনাচ। কি চমৎকার। কি সন্তান আমরা। কতটা অপদার্থ। কতটা নীচে নামলে মা একথা বলতে পারেন।

— লজ্জার কথা। মা নাচ দেখাতে আসছেন সন্তানদের; উলঙ্গনাচ। কি চমৎকার। কি সন্তান আমরা। কতটা অপদার্থ। কতটা নীচে নামলে মা একথা বলতে পারেন।

তখন সন্তানরা কেঁদে চিৎকার করে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। মা, আমরা অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি। আর এই ধরণের কাজ করবো না। আমাদের তুমি ক্ষমা কর। এই অধম সন্তানদের তুমি ক্ষমা কর। তুমি যা বলবে, আমরা তাই করবো।

— তা, তোরা করবি?

— করবো, মা।

সবাই ফুলের মালা নিয়া আসছে মাকে দেবার জন্য।

মা বললেন, ওগুলো (ফুলের মালাগুলো) নিয়া ড্রেনে (নর্দমায়) ফেলাইয়া দিয়া আয়। সব ড্রেনে ফেলাইয়া দিয়া আয়।

— মা, তুমি গলায় মালা পরবে না?

— না, তোদের এই মালা আমি গলায় দেব না। ঘৃণাবোধ করি।

— কেন, মা?

— আমার গলায় কিসের মালা দেখতে পাচ্ছিস,

— আরে বাপরে বাপরে। সব দেখি হাঁ কইরা রইছে। সব হাঁ কইরা রইছে মা।

— হাতে কি আছে, দেখতে পাচ্ছিস্ ?

— হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

— এই মালা আমাকে দিতে পারবি ?

— মা, এই মালা কি করে দেব?

মা সন্তানদের হাতে নিজের হাতের খড়্গটা তুলে দিলেন।

— মা, তাহলে তো আমাদের নিজেদের গলাই কেটে দিতে হবে।

— তাহলে বুঝতে পেরেছিস্ তোরাই অপরাধী তোরাই দানব, তোরাই শোষক, তোরাই সর্বনাশক। তোদের মাথাই আমার দরকার।

সত্যিই তো। আমরাই তো দানব। রাক্ষস খুঁজতে আর দূরে যেতে হবে না, বনে যেতে হবে না। রাক্ষস আমরা নিজেরা। শোষক আমরা নিজেরা, অসুর আমরা নিজেরা। আর বলি দেই নিরীহ ছাগকে। সুতরাং অপরাধের চরম মাত্রায় গিয়ে আমরা পৌঁছেছি।

তাই তোমরা নিজেদের কুবৃত্তি, অসুরবৃত্তি দমন করবার জন্য ঐ খড়্গটি নিয়ে বল, 'ত্যাগ অস্ত্রের মাধ্যমে আমরা অসুরবৃত্তিকে দমন করবো'। আর বাইরের যে অসুর, এটা কেউ এভাবে দমন করতে পারবে না। আগে ভিতরের অসুরকে দমন করতে হবে। তারপর হল অন্য কথা। সুতরাং পূজাই যদি থাকে, পূজার আদর্শ যদি আমরা মানি, দেবতার মন্দিরে যদি আমরা পূজা করে থাকি, গয়া গঙ্গা তীর্থকে যদি তোমরা মানো, আছে কিনা, সেটা হল পরবর্ত্তী কথা, তবে যেটা চলছে, সেই সূত্র ধরে আমাদের কিছু করণীয় আছে কি? সুতরাং আজকের সমাজে অসুর দমন করাই হল বড় কথা।

অসুর কারা? সমাজকে যারা শোষণ করছে, তারাই অসুর। সেই শোষণের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। তাই সন্তানদল বেদনীতি তথা বেদগত প্রাণ হয়ে নামের মাধ্যমে, প্রেমের মাধ্যমে, জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজকে সংশোধন করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তারা মার খেয়ে যাচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে, লাঞ্ছনা সহ্য করছে, নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

অসুর কারা? সমাজকে যারা শোষণ করছে, তারাই অসুর। সেই শোষণের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। তাই সন্তানদল বেদনীতিতথা বেদগত প্রাণ হয়ে নামের মাধ্যমে, প্রেমের মাধ্যমে, জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজকে সংশোধন করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তারা মার খেয়ে যাচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে, লাঞ্ছনা সহ্য করছে, নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। তবু সন্তানদলের উপরে কঠিন এবং কঠোর নির্দেশ আছে, 'তোমরা মার খেয়ে যেও। মার দিতে যেও না।'

তবু সন্তানদলের উপরে কঠিন এবং কঠোর নির্দেশ আছে, 'তোমরা মার খেয়ে যেও। মার দিতে যেও না।' সেই কথাটাই যেন সব ভাইরা খেয়াল রাখেন। সব পার্টির তরফের সব ভাইরা খেয়াল রাখেন। সব পার্টির তরফের সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আমরা এগিয়ে গিয়ে মারামারি করতে যাচ্ছি না। আমাদের তরফ থেকে কোন সন্তান যদি এগিয়ে গিয়ে মারামারি করে, তাকে বেঁধে পেটানো হোক। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে মারামারি করতে আমি নির্দেশ দেব না। আমার সন্তান যদি ব্যক্তিগতভাবে কোন অপরাধ করে, তারজন্য সে দায়ী। সন্তানদল দায়ী হবে কেন? আমি জানিয়ে দিচ্ছি, আমার অনেক সন্তান আছে তো। তারমধ্যে অনেক জন্তু আছে তো; আসলেই একবারে পোষ মানে না। অনেককে জঙ্গল থিকা (থেকে) ধইরা আনা হয় তো প্রথমে। অনেক খাড়া খাড়া কথা বলা আছে এখানে। একেবারে সাংঘাতিক, সাংঘাতিক সব। অনেক ঝগড়া বিবাদের জেরে নানারকম অভিযোগ আছে এদের পিছনে। সেইসব নিয়েই তো আমার কাছে ভর্ত্তি হয়েছে। সেইসব ব্যক্তিরা যদি ধরা পড়ে, মারামারি করে; লকেট একটা গলায় ঝুলানো থাকে; তখন কি বলবে, সন্তানদলের লোক মারপিট করছে?

আরে, সন্তানদলের ছেলেরা মারপিট করবে কেন? এরকম ঘটনার সঙ্গে সন্তানদলের কোন সম্পর্ক নেই।

তাই সব পার্টির সমস্ত ব্যক্তিদের আমি জানাচ্ছি, তারা যেন দয়া করে অযথা আমাদের খুঁচিয়ে ঘা না করেন। আমি কাউকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি, এটা যেন তারা মনে না করেন। যেমন, অনেকে টাকা দিয়ে লোক রাখেন। বেশীর ভাগ পার্টিই টাকা দিয়ে লোক রেখে কাজ করায়, এটা দেখানো, ওটা দেখানো, নাম করানো ইত্যাদি নানা কাজ। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই টাকা

দিয়ে কাজ করানো হয়। আর আমার সন্তানদের দিল দিয়ে কাজ করানো হয়। এটাই বেশীকম (পার্থক্য), একটা দিলের বিনিময়ে, একটা অর্থের বিনিময়ে। সুতরাং এইটুকুনু জানিয়ে দিচ্ছি সবাইকে, বারবার করে আমাদের যে ঘা দিচ্ছে, আঘাতকরছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে; খুব ভাল কথা। কিন্তু আঘাত খেতে খেতে উঃ করে তো উঠতে পারে, পালটা জবাবও তো দিতে পারে। তারা কি চান, আমাদের সাথে একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে সবাইকে দেখাতে যে, দেখুন, সন্তানদল এরকম অশান্তি করছে। এটা কি ঠিক হবে? কিন্তু আমি বারবার করে জানাচ্ছি, আমি যখন প্রতিষ্ঠা করেছি, আমি যখন তৈরী করেছি, আমিই একথা বারবার জানাচ্ছি, আর যেন বারে বারে চুলাকিয়ে ঘা না করেন। বেশী বাড়াবাড়ি যেন দয়া করে আর না করেন এবং পুলিশ ভাইদের জানাচ্ছি তারা যেন নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন। যদি অন্যায় হয়ে থাকে সন্তানদলের ভিতরে, আমাকে যেন straight (সোজাসুজি) জানান। তার আগেই যেন আর্মড্ পুলিশ নিয়ে এসে বাড়ীতে না উপস্থিত হন। আগে জানাবার সুযোগ, গড়বার সুযোগ যেন দেওয়া হয়। আগে এরকম হয়েছে, ২০০/২৫০ আর্মড পুলিশ এসে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, প্রফুল্ল সেনের আমলে জমিমারার কেসে। তাই সরকারকে অনুরোধ করছি, পুলিশদের অনুরোধ করছি, এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। অনেক আঘাত দিয়েছে। অনেক ব্যথা সহ্য করেছি। তাই বারবার করে জানাচ্ছি, যদি সন্তানদলের তরফ থেকে কারও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যায়, অন্যায় অপরাধ পাওয়া যায়, ভাল করে খোঁজ নিয়ে নেবেন, আমাকে জানাবেন, অমুক জায়গায় ত্রুটি করছে, অন্যায় করছে। যদি ত্রুটি করে থাকে, তাকে দায়ী করবেন। কিন্তু সন্তানদলকে অযথা দায়ী করবেন না। এটা জানানো আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তারপরেও যদি আপনারা খোঁচাখুঁচি করতে যান এই মনে করে যে, 'আমার হাতে ক্ষমতা আছে, ইচ্ছামতন মার দিয়া যাই, ইচ্ছামতন জ্বালাই' তারপরের পাল্টা জবাবে কিন্তু আমরা ছেড়ে দেব না। যেইভাবে পারি জবাব

তাই বারবার করে জানাচ্ছি, যদি সন্তানদলের তরফ থেকে কারও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যায়, অন্যায় অপরাধ পাওয়া যায়, ভাল করে খোঁজ নিয়ে নেবেন, আমাকে জানাবেন, অমুক জায়গায় ত্রুটি করছে, অন্যায় করছে। যদি ত্রুটি করে থাকে, তাকে দায়ী করবেন। কিন্তু সন্তানদলকে অযথা দায়ী করবেন না।

দিয়ে যাব আত্মরক্ষার জন্য। আত্মরক্ষা করার অধিকার সবারই আছে। আমাদের যদি বারেবারে আঘাত দেওয়া হয়, আড়াই কোটি সন্তানের রক্ত আমরা দেব। আপনারা ভুলে যাবেন না, আড়াই কোটি লোক যদি মৃত্যুকে বরণ করে, তবে আপনাদের মতো লোকদের উড়িয়ে দেওয়াটা কোন অসুবিধার ব্যাপার নয়।

কিন্তু এটা দুঃখের কথা। এটা অহঙ্কারের কথা নয়। আমি চাই না খুনখারাপি। আমি চাই না কাউকে আঘাত দিতে। কিন্তু বারবার আঘাত দিতে দিতে, দিতে দিতে চরম তিক্ততার সৃষ্টি করে ছাড়ছে সবার ভিতরে। আজ আমার সন্তানরা আমাকে ত্যক্ত বিরক্ত করে তুলছে, 'আমরা খুন করবো, আমরা মারধর করবো, বাবা একবার আদেশ দাও।'

— আমি বলি ধৈর্য ধরো।

হোচিমিন সহ্য করেছিল। কমরেডরা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল হোচিমিনের উপরে। হোচিমিন শুধু, একটি কথাই বলেছিল, 'ধৈর্য ধরো, সহ্য করো।' ধৈর্য সহ্যের চরম সীমানার পরিচয় দিয়েছে হোচিমিন। সেই পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি আমরা। আমি শুধু সন্তানদের বলছি, 'ধৈর্য ধর, মার খাও। মার খেয়ে গায়ের ছালবাকলা (চামড়া) উঠছে'?

— না, ওঠে নাই।

— আরেকটু মার খাও। ছালবাকলা উঠুক।

তাই সব ভাইদের জানাচ্ছি, পুলিশ ভাইদের জানাচ্ছি, পার্টির লোকদের জানাচ্ছি, আমি যা বলি, ফাঁকি দিয়ে কথা বলি না। ছল-চাতুরী করলে আড়াইকোটি, তিন কোটি লোকের ঠাকুর হতে পারতাম না। আমি যা বলি সোজাসুজি বলি। পুলিশ ভাইরা তো আমাদেরই রক্ত, আমাদেরই ঘরের সন্তান। তারা যেন নিরপেক্ষভাবে থাকেন। কারও তাবেদারী করে বা অন্যের কথা শুনে আমাদের উপরে নির্যাতন

হোচিমিন সহ্য করেছিল। কমরেডরা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল হোচিমিনের উপরে। হোচিমিন শুধু, একটি কথাই বলেছিল, 'ধৈর্য ধরো, সহ্য করো।' ধৈর্য সহ্যের চরম সীমানার পরিচয় দিয়েছে হোচিমিন। সেই পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি আমরা।

না করেন বা আমাদের সম্বন্ধে যেন আজেবাজে রিপোর্ট না দেওয়া হয়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ আমরা কোন কিছুর মধ্যেই থাকি না। রাজনীতি করি না। কারও দালালি করতে যাই না। কোন খুনখারাপিতে যাই না, কারও কোনরকম ক্ষতির চিন্তা করি না। কিন্তু আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অযথা অত্যাচার করছে। বারবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘা করলে বাচ্চাগুলোর তো রক্তমাংসের শরীর। এরবার যদি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তখন আমি সামাল দিতে পারবো না। শুধু এটাই শেষ নয়।

আমি সমস্ত দেশের ভাইবোনদের জানাচ্ছি, অমুক মঠ বা তমুক মঠের শিষ্য হিসাবে আমি কাউকে কিছু বলে যাচ্ছি না। আমি বেদের সন্তানদের জাগিয়ে তোলার জন্য বলছি, দেশের মা বোনেদের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এর সুবন্দোবস্ত করবো; এই অন্যায়ের প্রতিকার করবো। এইভাবে চলতে দেওয়া চলবে না। তারজন্য আমরা ইলেক্শনে (election) দাঁড়াবো না, গদীতে বসবো না। কেউ যেন আমাদের সম্পর্কে এসব চিন্তা না করেন। আমাদের জন্য গদী ছেড়ে দিলেও একটা জন্তুকে বসাবো। তবু আমরা বসবো না। কেউ যদি বলে সন্তানদলকে গদীটা দিতে চাই।'

এই অন্যায়ের প্রতিকার করবো। এইভাবে চলতে দেওয়া চলবে না। তারজন্য আমরা ইলেক্শনে (election) দাঁড়াবো না, গদীতে বসবো না। কেউ যেন আমাদের সম্পর্কে এসব চিন্তা না করেন। আমাদের জন্য গদী ছেড়ে দিলেও একটা জন্তুকে বসাবো। তবু আমরা বসবো না।

আমরা বলবো, ভাল কথা। গদীটা রাখো, দেখি, উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যায় কি না। উপযুক্ত যাকে পাবো, তাকেই বসিয়ে দেব। আর বলবো, 'হে শাসনকর্তা, ভাল কইরা শাসন কইরো।' সন্তানদল গদীতে বসবে না। ঐ উপহাসের পাত্র হতে রাজী নয় সন্তান দল। সন্তানদল ক্ষেত নিড়াচ্ছে। আগাছা আর পরগাছা দেখলে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাই না করলে আসল গাছ মরে যেতে পারে। আমরা বুঝে বুঝে সেইমতো কাজ করবো। এখানে রাজনীতির ছোঁয়াচ নেই। শুনতে রাজনীতির মত লাগলেও কথাগুলো রাজনীতির নয়। তাহলে সরকারের সব দেবতাদের band কইরা দেওয়া

উচিত এবং নির্দেশ দেওয়া উচিত যে, সব মন্দিরে তালা চাবি দাও। কারণ খড়গ হাতে, ত্রিশূল হাতে কোন দেবতাদের রাখা হবে না।

দেবদেবতাদের হাতে এই অস্ত্রগুলি কেন?

— এগুলি কেন? তাদের ভক্তরা শুধু বেলপাতা, তুলসীপাতা, ঘাসপাতা দিয়া পূজা করবে, সেইদিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমি সেই কথাই বলছি, ঘাসপাতা, আমপাতা, বেলপাতা, কুমড়াপাতা দিয়া পূজা করা চলবে না। এবার আস মাঠে যাও।ঐ শিবের দেওয়া মায়ের (মা দুর্গার) হাতের ত্রিশূলটা ধর এবং সেইভাবে কাজ কর।

আমরা খুনখারাপি চাই না। একটা কথা বললেই তার আবার অর্থ ধরে নেবে, এই বুঝি আমরা খুন চাই, মারপিট করতে চাই। আমরা অপারেশন করে ক্লেদগুলোকে বের করে দিতে চাই। আমরা সুস্থ সমাজ চাই, সুন্দর সমাজ চাই। আমরা সকলকে ভালবাসতে চাই, কারণ যে রক্ত নিয়ে এসেছি যে রক্ত বহন করে নিয়ে চলেছি, তা হল মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের রক্ত। সুতরাং ঐ রক্ত বিশ্বাসঘাতকের রক্ত নয়, ঐ রক্ত খুনখারাপি করার রক্ত নয়। ঐ রক্ত প্রেম দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে সবাইকে আপন করে আনে। নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে গিয়েছিলেন মহাপ্রভু। তাঁর ভক্তরাও রেহাই পায়নি। তাই এই রক্তের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। আজ আমার জন্মদিনে কর্মীদিবস উপলক্ষ্যে কর্মীবৃন্দ হিসাবে তোমাদের সম্বোধন করছি। তোমরা কর্মী। কর্মই তোমাদের ধর্ম। দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি। আড়াই কোটি, তিনকোটি সন্তানতো আর এমনি ঘরে বসে থেকে হয়নি। আর বেশীকিছু বলতে চাই না। কিন্তু মাঝে মাঝে মেজাজটা চড়ে যায় বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে। আমি গ্রামে গ্রামে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি চরম দারিদ্র্য। যাদের খাওয়া জোটে না, কিছু নাই, তাদের ঘরে ঘরে আমি যাই। নিজের চোখে দেখে আসি। খালি একখানা চাদর গায়ে দিয়ে যাই। কোন সুব্যবস্থা নাই, সুরাহা নাই।

আজ আমার জন্মদিনে কর্মীদিবস উপলক্ষ্যে কর্মীবৃন্দ হিসাবে তোমাদের সম্বোধন করছি। তোমরা কর্মী। কর্মই তোমাদের ধর্ম।

তাই তোমাদের কাছে আমি বারেবারে বলছি, যেই সুর তোমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছি, সেই সুরকে পাথেয় করে পথ চলবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ হরেরাম, তোমরা এবার করবে রাম নারায়ণ রাম। এই রাম নারায়ণ রাম আশ্রমের বৈরাগী আর বোষ্টমের গান নয়। এই গান হচ্ছে সেই গান, যে গান করলে ভিতরের গান (সুর) ফুটে ওঠে। দেহের ভিতরে মহা যন্ত্রের শক্তি ফুটে উঠবে। এই রাম নারায়ণ রামের বিরাট অর্থ আছে। সেই বিরাট অর্থবোধে এই রাম নারায়ণ রাম। সেই মহানামের নাম অনুযায়ী এখানকার দেবদেবতা রাম, নারায়ণের নামকরণ করা হয়েছে। আকাশের কৃষ্ণের নাম অনুযায়ী এই কৃষ্ণের কৃষ্ণ* নাম রাখা হয়েছে। তাই 'রাম' শব্দের একটা অর্থ আছে, 'নারায়ণ' শব্দেরও একটা অর্থ আছে। 'রাম' নামে অনন্ত বিশ্বের সুর এবং ধ্বনিকে বোঝানো হয়েছে। শব্দ এবং ধ্বনির সংকীর্তনের মহা সুরধ্বনি হচ্ছে রাম নারায়ণ রাম। তাই এই গান হচ্ছে মহান অগ্নিস্বরূপ, মহান অস্ত্রস্বরূপ। এই গানের অর্থবোধে সমাজকে করবে সর্বাঙ্গসুন্দর। তাই ত্রিশূল হাতে স্বয়ং শিব অনাহতে লিখলেন রাম নারায়ণ রাম। বেদমন্ত্র .....। শিবের সর্প আছে বিষহরি। অনাহতে বিষ হরণ করে, বিশুদ্ধে শোধন করে শিব আজ্ঞাচক্রে চলে গেলেন। মহাকাশে মহানাম রাম নারায়ণ রাম। সপ্তচক্রের স্বরগ্রাম সা রে গা মা পা ধা নি, রাম নারায়ণ রাম। বেদমন্ত্র .....। আজ্ঞাচক্রে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না সূর্যের আলোকে আলোকিত, অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। বেদমন্ত্র .....। সহস্রারে সহস্র সূর্য। সহস্রার সহস্র সহস্র সূর্যের আলোকে আলোকিত; সেই জ্যোতির্লোকে শিব গিয়ে বসলেন। সূর্যের আলোক, সেই যে, গলিত লাভা, সেই যে অগ্নি সেই যে উথালপাথাল, সেই সুরে মহাসুরের ধ্বনি রাম নারায়ণ রাম। বেদমন্ত্র .....।

শিবের সর্প আছে বিষহরি। অনাহতে বিষ হরণ করে, বিশুদ্ধে শোধন করে শিব আজ্ঞাচক্রে চলে গেলেন। মহাকাশে মহানাম রাম নারায়ণ রাম। সপ্তচক্রের স্বরগ্রাম সা রে গা মা পা ধা নি, রাম নারায়ণ রাম। বেদমন্ত্র আজ্ঞাচক্রে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না সূর্যের আলোকে আলোকিত, অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

---

* ধ্যানেতে বসিয়া গর্গ দিল কৃষ্ণ নাম।

দেশের সন্তানরা, বেদের সন্তানরা সবাই চলো, সবাই চলো সেই সভায়। সেখানে একজাতি, একনীতি, এক ভাষা, এক জল, এক চন্দ্র, এক সূর্যের তলে আমরা মানুষ। তাই সেখানে কেন কর বিবাদ? কেন কর বৈষম্যের খেলা? তোমাদের জ্ঞানাগ্নি, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলত হল এবং সহস্র সহস্র সূর্যের ক্ষমতা এই জ্ঞানাগ্নিতে, জ্ঞানচক্ষুতে বহির্গত হলো। তোমাদের জন্মই যে মৃত্যু, এই কথাটা ভিতরে এবং বাইরে এমনভাবে গেঁথে নাও, যেন আর ভুল না হয়, আর ভুল না হয়। মৃত্যু যে অনিবার্য এই কথাটা তারা ভাল করে গেঁথে নিল। হে দেশবাসী, বড়ই দুঃখের বিষয়, বড়ই দুঃখের কথা, মৃত্যু তোমাদের আছে জান, তবু ধ্যান ধারণায়, চিন্তায় ভাবনায় মৃত্যুকে ধরে রাখতে পারনি। যদি গেঁথে রাখতে পারতে, জীবনের চলার পথে যদি মৃত্যু চিন্তাকে গেঁথে রাখতে পারতে, একটা কথাতেই যথেষ্ট, তবে তোমাদের জীবনের চলার পথের ধারা উল্টো পাল্টা হতো না। তাই মৃত্যুকে জানানো হচ্ছে; মৃত্যু অনিবার্য, মরতে হবে, কথাটা জানা যাচ্ছে; কিন্তু কথাটা স্রোতের মত চলে যাচ্ছে। তাই বেদ বলেছেন, আজ্ঞাচক্রে সহস্রারে সেই সুরগীতির সুরগান রাম নারায়ণ রাম। তোমরা এই কথাটা মনে রেখো, এই জীবনের খেলা এইটা, এখানে মৃত্যু অনিবার্য। তাই মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম।

হে দেশবাসী, বড়ই দুঃখের বিষয়, বড়ই দুঃখের কথা, মৃত্যু তোমাদের আছে জান, তবু ধ্যান ধারণায়, চিন্তায় ভাবনায় মৃত্যুকে ধরে রাখতে পারনি। যদি গেঁথে রাখতে পারতে, জীবনের চলার পথে যদি মৃত্যু চিন্তাকে গেঁথে রাখতে পারতে, একটা কথাতেই যথেষ্ট, তবে তোমাদের জীবনের চলার পথের ধারা উল্টো পাল্টা হতো না।

সঙ্গীতের যে স্বরগ্রাম সা রে গা মা পা ধা নি — এই সা তে যেই সুরগান গাওয়া যায়, তারই ২৫ হাজার সিঁড়িতে উপরে উঠলে দেখা যায়, মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে এই দেহবীণাযন্ত্রের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সুরে সুরে এই স্বরগ্রাম জানা যায়। এই ২৫ হাজার সিঁড়িতে যেই কথা, যেই ধারা, যেই দেহবীণার কথা আছে, যেই স্বরগ্রামের কথা আছে, তাই

যদি সা রে গা মা-র কথাগুলো, স্বরগ্রামের কথাগুলো সত্যি হয়ে থাকে, তাঁদেরই (২৫ হাজার সিঁড়ির উপরের মহানদের) ভক্তের ভক্তদের অনুগতের কথা, সেরা কথা, সেরা মন্ত্র, সার কথা হল, মূলাধারে সহস্রারে আছে যেই কথা গাঁথা, মহাকাশে মহানাম রাম নারায়ণ রাম। সেই গান, সেই গীতি দেওয়া হয়েছে তোমাদের মন্ত্রে।

হল রাম নারায়ণ রাম। যদি সা রে গা মা-র কথাগুলো, স্বরগ্রামের কথাগুলো সত্যি হয়ে থাকে, তাঁদেরই (২৫ হাজার সিঁড়ির উপরের মহানদের) ভক্তের ভক্তদের অনুগতের কথা, সেরা কথা, সেরা মন্ত্র, সার কথা হল, মূলাধারে সহস্রারে আছে যেই কথা গাঁথা, মহাকাশে মহানাম রাম নারায়ণ রাম। সেই গান, সেই গীতি দেওয়া হয়েছে তোমাদের মন্ত্রে।

তাই বেদজ্ঞরা দ্বারে দ্বারে সর্বত্র সর্বজায়গায় বললেন, মহাকাশের মহানাম বিরাট অর্থবোধে বিজ্ঞানসম্মত সেই নাম রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ রাম। হে পথিকগণ, বল সবে রাম নারায়ণ রাম। এই রাম নারায়ণ রাম রইল তোমাদের পথের পাথেয়। এই মহা অস্ত্র (রাম নারায়ণ রাম) তোমাদের হৃদয়ে রইল গাঁথা। এই অস্ত্রের কথা শিব নিজে বলেছেন, বিষ্ণু নিজে বলেছেন। গায়ত্রী নিজহস্তে অর্পণ করেছেন। কাকে দিয়েছেন সেই নাম? এই নাম তোমরা পেয়েছ। এই নাম তোমরা গেয়ে যাবে পথে ঘাটে। আপনি তোমাদের এই মহানামের মহাসুরের স্ফূরণ হবে। অসুর আপনিই দমন হয়ে যাবে। তোমাদের অস্ত্র ধরতে হবে না। তোমাদের রাগ, অভিমান, মেজাজ দেখাতে হবে না। এই মহানামের অর্থ রয়েছে বিরাট, শব্দে রয়েছে মহাকাশের ধ্বনি। আপনি এই মহামন্ত্রের মহাধ্বনি মহাকাশের মহাসুরে ছেড়ে দেবে। মহাকাশে গাইবে মহাসুরের গান রাম নারায়ণ রাম।

এই নাম তোমরা গেয়ে যাবে পথে ঘাটে। আপনি তোমাদের এই মহানামের মহাসুরের স্ফূরণ হবে। অসুর আপনিই দমন হয়ে যাবে। তোমাদের অস্ত্র ধরতে হবে না। তোমাদের রাগ, অভিমান, মেজাজ দেখাতে হবে না।

দেশে দেশে যাবে তোমরা নির্ভয়ে। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে পার্বতীর যখন অসুরের কাছে হেরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন পার্বতী কি করলেন? তিনি কাতরস্বরে শিবকে বললেন, 'প্রভু, আমি আর পারছি না'।

শিব মধুর স্বরে বললেন, পারছো না?

তখন শিবশম্ভু পার্বতীর হাতে দিলেন ত্রিশূল, - ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার; ঐ সুরে গাঁথা

আছে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে গাঁথা আছে। রাজা দশরথের ছেলের নাম রাম। 'রাম' অর্থ বিরাট। মহাকাশের অর্থ অনুযায়ী, নাম অনুযায়ী দশরথের ছেলের নাম রাম।

তোমাদের বিরাট অস্ত্র তোমাদের হাতে। এই আজ্ঞাচক্রের জ্ঞানচক্ষুতে আছে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না সমন্বিত এই ত্রিশূল, শিবের ত্রিশূল। এটা লোহার ত্রিশূল নয়। আজ্ঞাচক্রের ত্রিশূল নিয়ে তোমরা এগিয়ে যাবে। তোমরা নির্ভয়ে নির্ভাবনায় এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছ। তোমরা নির্ভয়ে নির্ভাবনায় এইভাবে এগিয়ে যাবে। মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ। তোমরা সেই পথের পথিক। এটা দুর্বলতার কথা নয়। গুরুর মুখনিঃসৃত কথা। তাই তোমরা কোনরকম ভয়ভীতিতে না গিয়ে এই মহাকাশের মহানাম নিয়ে এগিয়ে যাবে। জয় তোমাদের অনিবার্য।

তোমাদের বিরাট অস্ত্র তোমাদের হাতে। এই আজ্ঞাচক্রের জ্ঞানচক্ষুতে আছে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না সমন্বিত এই ত্রিশূল, শিবের ত্রিশূল। এটা লোহার ত্রিশূল নয়। আজ্ঞাচক্রের ত্রিশূল নিয়ে তোমরা এগিয়ে যাবে।

যাই হোক, জন্মদিনে তোমরা কাজ করবে নির্ভয়ে। কোনরকম উচ্ছ্বাসে যাবে না, মারামারিতে যাবে না। যদি তোমাদের উপরে নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা করে যায়, চরম নির্যাতন যখন হবে, তখন আমাকে জানাবে। আজ এই থাক। রাজনীতির মঞ্চের দিকে তোমরা যাবে না, খুনখারাপির দিকে যাবে না। তোমাদের সবাইকে অন্তরের আশীর্বাদ জানাচ্ছি। দিনদিন তোমাদের শক্তিবৃদ্ধি হোক। ধৈর্য ও সহ্যের চরম পরীক্ষা দিয়ে তোমরা এগিয়ে যাও। জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় তোমরা বিজয়ী হয়ে, বিনয়ী হয়ে পথ চলো। ধৈর্য ও সহ্যের চরম পরিচয় দিয়ে মহাকাশের মহানাম রাম নারায়ণ রাম ঘরে ঘরে প্রচার করবে। নাম উচ্চারণ করার সময়ে কারও অসুবিধা করবে না। মাইক জোরে বাজাবে না। রোগী বা পরীক্ষার্থী থাকলে তাদের অসুবিধা করবে না। সেইভাবেই তোমরা চলবে। সেইভাবেই তোমরা কাজ করবে। আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ ৫৯ - তম জন্মতিথি

৩০-১০-১৯৭৮ (সুখচর)

ন্যায়েরদন্ড ত্রিশূল আজ আমাদের হাতে

আজ এখানে উৎসব পালন করা হয়নি। কর্মীদিবস পালন করা হয়েছে। *বন্যার্ত্তদের জন্যই যা কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেটুকু না হলে নয়, তাই শুধু এখানে করা হয়েছে। যারা এখানে এসেছে, পুলিশ ভাইয়েরা এসেছে, দর্শনার্থী যারা এসেছে, বাজিয়েরা এসেছে, এরা সবাই কর্মীদিবসে যোগদানকারী হিসাবে এসেছে। বাজিয়েরা স্ব-ইচ্ছায় এসেছে। খুব সুন্দর বাজিয়েছে। সবাই শুনে খুশী হয়েছে। তোমরা এইভাবেই বাজিয়ে বাজিয়ে রাম নারায়ণ রাম প্রচার করে যাও। জায়গায় জায়গায় প্রচার কর। ভারী চমৎকার।

দেশের যা পরিস্থিতি, যা চলছে, এমনিই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। বিপ্লব আর কাউকে করতে হবে না। চারিদিকে যা অবস্থা প্রকৃতি নিজহস্তে সব ভার নিয়েছেন। একের পর এক তাঁর কাজ তিনি (প্রকৃতি) করে যাচ্ছেন। যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা আর বলার নেই। সবসময় সংবাদ আসছে, সবসময় লোক আসছে। যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সাহায্য করে তো আর জোড়া দেওয়া যায় না। শুধু মুখে বলা হয়, আমরা সাহায্য

দেশের যা পরিস্থিতি, যা চলছে, এমনিই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে । বিপ্লব আর কাউকে করতে হবে না। চারিদিকে যা অবস্থা প্রকৃতি নিজহস্তে সব ভার নিয়েছেন।

---

* ১৯৭৮ সালে ভয়ঙ্কর বন্যায় শত শত মানুষের জীবনাবসান হয়।

করছি, সাহায্য করছি। যে ক্ষতি হয়ে হেল, কোনকিছুতেই তার আর পূরণ হবে না। কত হাজার হাজার ছেলেমেয়ে কিভাবে যে দিন কাটাচ্ছে, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

এখন যে আমাদের সমাজ, এখানে একজন বড় হতে গেলে আরেকজনের যে সাহায্য করতে হয়, সেটাই নেই, সেই আগ্রহটাই নেই। একজন আরেক জনকে কি করে দাবাবে, কি করে কমাবে, এটাই হল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেশী। আমরা বেদের পূজারী। অনেক ঝড় ঝাপ্‌টা, অনেক আঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমাদের তরী ভাসিয়ে দিয়েছি। আমরা কাজ করবো। আমরা কাজ করতে চাই, কিন্তু বিবাদ করে নয়। আমরা মিলনের সুরে কাজ করতে চাই।

বেদের যুগে বেদের প্রচারকরা, বেদজ্ঞরা বেদপ্রচার করতেন। আবার কিছুসংখ্যক লোক ছিল, যারা সবসময় তাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতো নানাভাবে। কিন্তু এরকম কখনো হতে পারে না। দুর্যোগ সর্বদা থাকতে পারে না। সূর্যকে মেঘে কতক্ষণ আবরণ করে রাখতে পারে? সূর্যের তেজে মেঘ আবার অপসারিত হয়ে যায়। তাই বেদ হচ্ছে এমন একটি তেজ, যে তেজে সমস্ত দুর্যোগ অপসারিত হতে বাধ্য।

সূর্যকে মেঘে কতক্ষণ আবরণ করে রাখতে পারে? সূর্যের তেজে মেঘ আবার অপসারিত হয়ে যায়। তাই বেদ হচ্ছে এমন একটি তেজ, যে তেজে সমস্ত দুর্যোগ অপসারিত হতে বাধ্য।

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে বেদজ্ঞরা যখন কলম নিয়ে বসতেন, তারা লিখতেন আদি বেদের সুর। আমার আর অন্য কিছু বলার নাই। শুধু বলতে চাই, বেদের কর্মেতে আমাদের কি করতে বলেছেন ? এইটাই হল কথা। এই সময়ে বেদের সন্তানরা সুরের ভিতর দিয়ে সমাজকে শিক্ষা দিতেন। বেদের সন্তানরা সবাই হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরা, হাটে হাটে সব বেড়িয়ে পরতেন। দলে দলে ছেলে মেয়ে, সবাইকে নিয়ে তারা বেড়িয়ে পরতেন। তারা বেদের ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। সাথে সাথে অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। সবাই সেই অর্থ বুঝে বুঝে কাজ করতো। একেকদলে ৮ জন ১০

জন করে করে গ্রামে গ্রামে গ্রামাঞ্চলে সব জায়গায় বেরিয়ে যেতেন। এইভাবেই তারা বেদপ্রচার করতেন। বেদমন্ত্র .....।

তারা বলছেন যে, তোমাদের এখন স্বর্গের সুখের কামনা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। মৃত্যুর পরে কোথায় যাবে, সেকথা এখন ভাববার প্রয়োজনীয়তা নেই। যেদিন তোমরা জানতে পারবে, মৃত্যুর পরে কোথায় যেতে হবে বা মৃত্যুর পরে যেতে হয়, যেদিন তোমরা এটা জানতে পারবে, সেদিন না হয় মৃত্যুর পরের ভাবনা ভাববে। কিন্তু আজ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবে, সেই ভাবনাটুকুনু আগে ভাব। কেমন করে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পার এবং সমাজকে রক্ষা করতে পার, তার ব্যবস্থা কর। বেদমন্ত্র ....., তোমরা খেটে খাও। পরিশ্রম কর। আধ্যাত্মিকতা বা গুরুগিরি বা কোনরকম দৈবের সুযোগ নিয়ে তুমি চলবে না। তুমি পরিশ্রম কর। এইভাবে নিজে চলো। তারপর সমাজে যারা অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছে, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করো। উপকার করতে পারলে উপকার করবে। কারও অপকার করতে যেও না। তুমি সবসময় অন্যের উপকার করবে।

আজকের সমাজে চিন্তা করে দেখ দেখি, সমস্ত দিক দিয়ে আমরা কত নীচে পড়ে আছি। একজায়গায় একস্থানে সব মানুষেরা বাস করছি, অথচ মানুষে মানুষে কত বৈষম্য। আমরা সেইভাবে সেইমতে সেইচিন্তাতে যদি একসুরে থাকতে পারি, তবে আর কোনরকম বিবাদ-বিচ্ছেদের প্রশ্নই-আসে না। কিন্তু না; আমরা এত স্বার্থের চিন্তা করি যে, বলার নয়। আমরা একা খেতে চাই, একা পরতে চাই, তাই আমাদের এই অবস্থা। বেদ বলেছেন, এই সমস্ত কোনরকম ঝঞ্ঝাট তোমরা করতে পারবে না। সমাজ রক্ষাকল্পে যা করা দরকার, তাই তোমাদের করতে হবে এবং সমাজ রক্ষার প্রয়োজনেই তাই তোমাদের করতে হবে। তোমাদের বলা হয়নি যে, তোমরা

আজকের সমাজে চিন্তা করে দেখ দেখি, সমস্ত দিক দিয়ে আমরা কত নীচে পড়ে আছি। একজায়গায় একস্থানে সব মানুষেরা বাস করছি, অথচ মানুষে মানুষে কত বৈষম্য। আমরা সেইভাবে সেইমতে সেইচিন্তাতে যদি একসুরে থাকতে পারি, তবে আর কোনরকম বিবাদ-বিচ্ছেদের প্রশ্নই-আসে না।

পাগড়ি পর, যুদ্ধ কর। হ্যান কর, ত্যান কর। কিচ্ছু বলা হয়নি তোমাদের। কিছু করার দরকার নেই। আগেই তো বললাম, আত্মরক্ষাকল্পে যা করার দরকার, তাই তোমাদের করতে হবে। তোমরা নিজেকে রক্ষা কর, সমাজকে রক্ষা কর, জাতিকে রক্ষা কর। আমরা কি করি জান ? আমরা যশ কিনতে চাই, নাম কিনতে চাই। তাতেই হচ্ছে আমাদের বিপদ। যশ, নাম কিনতে গিয়েই আমাদের সব বরবাদ হয়ে গেল।

আজ আমার মন বিক্ষিপ্ত, মন চঞ্চল। তোমাদের ভাইবোনেরা, দেশের ভাইবোনেরা কত কষ্টে কিভাবে যে দিন কাটাচ্ছে, বর্ণনা করা চলে না। তাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, অনেকের স্ত্রী পুত্র নাই, অনেকের বাবা নাই। কিরকম অবস্থা যে হয়েছে, বা হতে পারে, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। দেশের এই অবস্থায় কোন আনন্দ চলে না। কোন কিছু চলে না। বহু জায়গায় যাওয়ার জন্য, উদ্বোধন করার জন্য, মীটিং করার জন্য আমাকে বলেছিল, মনের যে অবস্থা তাতে সম্মত হতে পারিনি।

সুতরাং আর কিছু না। যে মহানাম রাম নারায়ণ রাম দিয়েছি তোমাদের, দিবারাত্র এই মহানাম স্মরণ করবে। জানি আমাদের মরতে হবে। মৃতুর হাত থেকে রক্ষা কেউ যখন পাচ্ছি না, আজ হোক, কাল হোক মরতেই যখন হবে, যুদ্ধ করবো কার জন্য? বাঁচার জন্য যে যুদ্ধ করবো, কতদিনের জন্য বল? চিরকাল বাঁচার জন্য যুদ্ধ করতে তো পারছি না। এই তো দেখ, ক্রমশঃ ক্রমশঃ বয়সের খাতে পা দিলাম। দিন তো ঘনিয়ে আসছে। এই দিনে জন্ম হয়েছে, কত বছর হয়ে গেল, বাপরে বাপ। সুতরাং বয়স ছাড়ছে না, সময়ও ছাড়ছে না, কালও ছাড়ছে না। সুতরাং কাউকেই ছাড়বে না। ছাড়ছে না যখন, ছাড়বে না যখন, তোমরা যখন জান এই কথাটা, সেইভাবে সেইমন নিয়ে তোমরা কাজ করবে সমাজে। অযথা সময় নষ্ট করবে না। অযথা বদনাম, অপবাদ, কারও সমালোচনা করা, কারও পিছনে লাগা, কারও ক্ষতি করা বা ক্ষতির চিন্তা করা, এগুলো করবেই

যে মহানাম রাম নারায়ণ রাম দিয়েছি তোমাদের, দিবারাত্র এই মহানাম স্মরণ করবে। জানি আমাদের মরতে হবে। মৃতুর হাত থেকে রক্ষা কেউ যখন পাচ্ছি না, আজ হোক, কাল হোক মরতেই যখন হবে, যুদ্ধ করবো কার জন্য?

না। কোন প্রয়োজন নাই। নিজে কি করে নিজেকে তৈরী করতে পার, সেই ব্যবস্থাটুকু করতে পারলে কর।

যে সুর তোমরা পেয়েছ, মহাকাশের মহানাম রাম নারায়ণ রাম, সেই মহানাম সবসময় একান্তভাবে করবে। সেই মহাকাশের মহানাম রাম নারায়ণ রাম তোমরা সবসময় স্মরণ করবে। এই মহানাম উচ্চারণ করলে অনিবার্যভাবে তোমরা মুক্ত হবে। তোমরা যেকোন কাজে উদ্ধার হতে পারবে এবং সফলতা লাভ করবে। তোমরা সফল হবে।

এই মহানাম উচ্চারণ করলে অনিবার্যভাবে তোমরা মুক্ত হবে। তোমরা যেকোন কাজে উদ্ধার হতে পারবে এবং সফলতা লাভ করবে। তোমরা সফল হবে।

এমন সুন্দর, এমন মধুময় নাম তোমরা পেয়েছ। তাই আমি আর বেশী কিছু বলবো না। হাজার হাজার জায়গায় ওরা (আমার সন্তানরা) কর্মীদিবস পালন করছে। আমার জন্মতিথি আমি কর্মীদিবস হিসাবে পালন করতে বলেছি। অনেকে ঘরে বসেই কর্মীদিবস পালন করছে। তাদের সবাইকে আসতে বারণ করে দিয়েছি। তাতে অনেকে দুঃখ পেয়েছে, মনঃক্ষুন্ন হয়েছে। সেইসব ভাইবোনদের সাথে তোমরা যোগাযোগ করবে। সব ভাইবোনেরা তোমরা সব একরক্তের। তোমরা সব এক শিকলে তৈরী হও। তোমরা সব যদি এক শিকলে থাকো, তোমাদের সাথে কে পেরে উঠবে বলতো? কত বড় বিরাট শক্তি তোমাদের। কত বিরাট শক্তিশালী তোমরা। যার এক কোটি ১২ লক্ষের মত শিষ্য, এক এক শিকলে বেঁধে বেঁধে যদি তোমরা সবাই চল, বিরাট বিরাটভাবে তোমরা এগিয়ে যেতে পার। তোমরা তো কারও সাথে যুঝতে যাচ্ছ না। আমরা তো অহঙ্কার করতে যাচ্ছি না। কিন্তু শিকল তো একেকটা এতটুক এতটুক । কিন্তু বিরাটভাবে যদি একটার পর একটা, একটার পর একটা একই বন্ধনে, একই মিলনের সুরে চলতে থাকে, কতবড় হয়ে যায়, দেখ দেখিনি। সুতরাং তোমরা সেইভাবে একত্র হয়ে যাও সব।

তোমরা সব এক শিকলে তৈরী হও। তোমরা সব যদি এক শিকলে থাকো, তোমাদের সাথে কে পেরে উঠবে বলতো ? কত বড় বিরাট শক্তি তোমাদের।

এই যে ঝগড়া কর, বিবাদ কর পাড়ায় পাড়ায় এসব কিছু করবে না। যে যা খুশী করুক, যে যা খুশী বলে যাক, তোমরা মনে রেখো, একটাও

পার পাবে না। অযথা যদি তোমাদের কিছু বলে, তোমরা কিছু বলবে না। এই একটা কথা মনে রাখবে। তোমরা কিছু বলবে না। তারা বলে যাক। এইটুকুনু মনে রেখো, কেউ পার পাবে না। তোমাদের উদ্দেশ্য তো খারাপ না। তোমরা তোমাদের কাজ করে যেও। তোমরা সেইভাবে চলবে, সেইমতে চলবে। যে যাই হোক, যে যাই করুক, তোমরা সবল হয়ে যেও। তোমরা এক রক্তের মনে রেখো। আমরা সেইভাবেই তৈরী। আমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি। যে যেমন খুশী চিন্তা নিয়ে চলুক, আমরা বিরাটের পথের পথিক, যাত্রিক। আমরা কোনকিছুর পরোয়া করি না এবং সেইভাবে কিছু করতে যেন না হয়। আমার সব সন্তানরা সব এক মায়ের পেটের সন্তান। সব (আমার) বাচ্চা মনে রেখো। এক গুরুর সন্তান, সব এক মায়ের পেটের সন্তান। তাই কত মধুর সম্পর্কে জড়িত আমি তোমাদের সাথে চিন্তা করে দেখো। আমার সাথে তোমাদের কত মধুর সম্পর্কে রেখেছি। আমি তোমাদের সেই গুরু তো নই। আমি তোমাদের সাথে সেইভাবেই মিশি। ঘরের বাপ বেটা বেটীর মতো মধুর সম্পর্ক তোমাদের সাথে আমার। আমি সেইভাবেই চলি। তোমাদের সুখ-দুঃখের সাথে জড়িত থাকি। অনেক সাধু সন্ন্যাসীদের দেখবা, এখানে একদিন থাকে, ওখানে একদিন থাকে। শিষ্যদের অশান্তির ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে, পালিয়ে থাকে। এরকম আমার মত কেউ না। অশান্তি পোহাইতেছি, ঝঞ্ঝাট পোহাইতেছি। রাত দুইটার সময় এক মরা (মৃতদেহ) নিয়া আইসা উপস্থিত। বাবা, মরা নিয়া আইছি।

আমার সব সন্তানরা সব এক মায়ের পেটের সন্তান। সব (আমার) বাচ্চা মনে রেখো। এক গুরুর সন্তান, সব এক মায়ের পেটের সন্তান। তাই কত মধুর সম্পর্কে জড়িত আমি তোমাদের সাথে চিন্তা করে দেখো।

আমি বলি, খুব ভাল করছো।

বুঝছো, আমার কি অবস্থা। এ ঠাকুর তো সে ঠাকুর নয় যে, লুকিয়ে থাকবে।

মাঝে মাঝে একটু চোখ বুঁজে থাকি। থাকি কেন? প্রথম প্রথম একটু চোখ বুঁজে থাকি। তারপর নামে বসে পড়ি। না, আমি এখন ধ্যানে বসবো।

আমি এখন কথা বলবো না, এই কথাটা প্রথম বলি। তারপর কাজে (জপে) বসে পড়ি।

কারণ একটা লেখাতে পারছি না। কাজ করতে পারছি না। কোন কিচ্ছু না। কোন লেখার কাজ, কোন কাজ কিছুই করতে পারছি না। চিঠিপত্র লেখার কাজ তো পরেই রয়েছে। একটা লেখাতে বসেছি। একজন এসে বললো, বাবা, একটা লোক আসছে, সাংঘাতিক অবস্থা।

— নিয়ে আয়।

এই করতে করতে লেখা বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং কোন কিছু হয় না। তাই মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে থাকি তো। প্রথমে চোখ বন্ধ করি। তারপর কাজ (জপ) করতে থাকি। এড়াইতে পারি। কিন্তু বেশীক্ষণ পারি না। সন্তানদের ফাঁকি দেওয়া যায়, বল তো? তোমাদের ফাঁকি দেওয়া মানে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। তখন কষ্ট লাগে। এতদূর থিকা আসলো। কত কষ্ট কইরা পয়সা খরচ কইরা আসলো। কথা বললাম না।

সন্তানদের ফাঁকি দেওয়া যায়, বল তো? তোমাদের ফাঁকি দেওয়া মানে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। তখন কষ্ট লাগে। এতদূর থিকা আসলো। কত কষ্ট কইরা পয়সা খরচ কইরা আসলো। কথা বললাম না।

আমি বলি, দেখতো, চইলা গেছে নাকি? ডাইকা (ডেকে) নিয়া আয়।

আবার একজন দৌড়াইয়া গেল ডাকতে । সে আইল। তারে বলি, দ্যাখ, তরে (তোরে) দেইখাই চোখ বুঁজছিলাম। বলা চাই। না বললে সূক্ষ্মে একটা ফাঁকি দেওয়া হলো। তরে দেইখা চোখ বুঁজছিলাম। পরে মনটা এমুন খারাপ হইল, কতদূর থেকে কষ্ট করে এসেছিস। তাই আবার ডাকালাম।

সে বলে, হ্যাঁ বাবা। তোমার দোষ নাই বাবা, তুমি কতক্ষণ বসছো।

— এইমাত্র বসছি।

দ্যাখ টাকাপয়সার সম্পর্ক যদি তর লগে (তোর সঙ্গে) আমার থাকতো, তাইলে হইতো একরকম কথা। তর অসুখ হইছে, আমার সারাইয়া দিতে হইবো। সেটা একরকমের সম্পর্ক। এখানে টাকাপয়সার সম্পর্ক নাই।

চাওয়া নাই পাওয়া নাই। যা পারি বললাম, না পারি বললাম না। যা পারি করলাম। না পারলে করলাম না। নিজেরাই (ভক্ত শিষ্যরা) দুঃখ করতাছে। বাবারে বললাম। বাবায় উত্তর দিলেন না। বাবায় কি করবে। সবাই তো দুঃখ পাচ্ছে, সবাই তো অশান্তি পাচ্ছে।

তাই আমার সাথে আমার ভক্ত এবং সন্তানদের সম্পর্ক এইরকম। ওদের সুখে দুঃখে তেজপাতা, লবঙ্গ, কালিজিরা থিকা (থেকে) শুরু কইরা সবটার মধ্যে জড়িয়েই আমাকে কথা বলে। তাই আমি সবটার মধ্যেই জড়িত। তোমাদের কাছে আমার এই কথা, আমাকে একটু কাজের সুযোগ সুবিধা তোমরা দেবে। বছর তো সরে যাচ্ছে। এইভাবেই দিন চলছে। আমাকে কাজের সুযোগ সুবিধা দিও। কাজ করে যাতে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মন্থন করা হলো নাতো।

তোমাদের কাছে আমার এই কথা, আমাকে একটু কাজের সুযোগ সুবিধা তোমরা দেবে। বছর তো সরে যাচ্ছে। এইভাবেই দিন চলছে। আমাকে কাজের সুযোগ সুবিধা দিও।

এই মহাকাশকে মন্থন করা দরকার। যেটা মন্থন করলে কিছু বার হবে, সেটা মন্থন করা দরকার। তাই শিশুবয়স থেকে যখন আমি ডুবুরী হয়ে জন্ম নিয়েছি, এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকেই ঠাকুর হয়েছি, তাইতো 'বালক ঠাকুর', বাচ্চা ঠাকুর, এটা তো গল্প কথা না। সবাই জানে। বদনাম তো কম নিই নাই। অন্য সাধু গুরু হইলে টিকতে পারতো না। একেবারে লোটা কম্বল নিয়া পালাইয়া যাইত। এত বদনাম দিয়েছে আমাকে। শেষে আমি দেখিয়ে দিয়েছি, গঙ্গা নদীকে। যত আবর্জনা, যত ময়লা এই গঙ্গায় পড়ে। কিন্তু আজও হিন্দুদের কাছে গঙ্গা অপবিত্র হয়নি। মা গঙ্গা, মা গঙ্গা — মাথায় জল দিচ্ছে। অঙ্গার (কয়লা) ফেলাইয়া দিছে। শ্মশানের অঙ্গার গঙ্গায় ফেলাইছে। ভাইসা (ভেসে) উঠছে। স্রোতে কোথায় নিয়া গেছে।

এত বদনাম দিয়েছে আমাকে। শেষে আমি দেখিয়ে দিয়েছি, গঙ্গা নদীকে। যত আবর্জনা, যত ময়লা এই গঙ্গায় পড়ে। কিন্তু আজও হিন্দুদের কাছে গঙ্গা অপবিত্র হয়নি।

মা গঙ্গা, মা গঙ্গা — মাথায় জল দিচ্ছে। তাইলে সেইসব আবর্জনা

আমার উপর দিয়াও আসছে। শিশুবয়স থিকাই আমি এই পথে আছি। বেশীবয়সের ঠাকুর হতে যাইনি। সেই শিশুবয়সেই গ্রাম গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ আসছে। আমি তো গদীর ঠাকুর হতে যাইনি। এই ঠাকুর গদীর ঠাকুর না। এমুন না যে, একজন মারা গেছে তার জায়গায় গদীর ঠাকুর হইয়া বসছি আমি। আমি আশ্রমের ঠাকুরও না, গদীর ঠাকুরও না। পাঁচবছর বয়স থেকে ঠাকুর হয়ে দীক্ষা দেওয়া শুরু করেছি। এটা গল্পকথা না। তোমাদের কাছে আমার বলা দরকার। ইস্কুলের হেডমাষ্টার, মাষ্টার, প্রতিবেশী, গুরুজন স্থানীয় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং দূরদূরান্তরের বহু ব্যক্তি ঐ শিশুবয়সেই আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছে। যাদের হাত-পা টিপে দিয়েছি, বাচ্চা বয়সে পাকা চুল বেছে পয়সা নিয়েছি। একজন ছিল, ৮ টা পাকাচুল বাছলে ১টা পয়সা দিত। সে এসেছে একদিন। এই, তর কাছে দীক্ষা নিতে আইছি। আমি তর কাছে দীক্ষা নিতে আইছি।

সেই শিশুবয়সেই গ্রাম গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ আসছে। আমি তো গদীর ঠাকুর হতে যাইনি। এই ঠাকুর গদীর ঠাকুর না। এমুন না যে, একজন মারা গেছে তার জায়গায় গদীর ঠাকুর হইয়া বসছি আমি।

আমি বলি, আরে বাবা, তুমি দীক্ষা নিতে আইছো ? আস আস আস। এরকম হয়েছে, একজন, দুইজন না, হাজার হাজার। গ্রামের প্রতিবেশীরা, তাদের দীক্ষা দেওয়া ঐ শিশুবয়সে, বড় কঠিন। তারা বেশীর ভাগই আমার ছোটবেলায় দীক্ষা নিয়েছে। আজও মাষ্টাররা অনেকে আসেন, তোমরা দেখেছ। জানা দরকার তোমাদের।

কেন বলছি তোমাদের কাছে? ফট্ কইরা একটা বদনাম দিয়া গেল গিয়া, যেরকম আমাকে দিয়েছে। যেই ধরণের বদনাম আমাকে দিয়েছে, সে আর কহতব্য নয়। পত্রিকা অফিসের প্রায় সব সাংবাদিকদের নিয়ে একবার মীটিং করেছিলাম। তারা এসেছিল। আমি তাদের বলেছি, 'দোহাই ধর্ম। আপনারা কখনও আমার সুনাম করবেন না। আপনাদের কলমের কত জোর আছে, আমি দেখতে চাই।'

— কেন ? একথা বলছেন কেন ?

— আপনারা যতটা পারেন, আমার বদনাম দেবেন। আর আমার

যদি হিম্মৎ থাকে ঐ বদনামের ভিতর দিয়েই আমি কাটিয়ে উঠবো।

— আপনি এতবড় কথা বললেন?

— নিশ্চয়ই।

বারীন ঘোষ ছিল আমার শিষ্য, বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের ভাই। সে বলছে, তিনি শালগ্রাম শিলা কি না। যেদিক দিয়ে যান, কোন up-down নাই।

আপনারা যতটা পারেন, আমার বদনাম দেবেন। আর আমার যদি হিম্মৎ থাকে ঐ বদনামের ভিতর দিয়েই আমি কাটিয়ে উঠবো।

আমি সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, আপনারা কোনদিন আমার সুনাম করবেন না।

এই বন্যায় বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য আমার সন্তানরা যে এত করছে, বাঁকুড়াতে প্রতিদিন হাজার হাজার রুটি করে পাঠাচ্ছে, কোন কাগজেও লেখে না, টি. ভি. তেও দেখায় না। কোথাও লেখে না। আর এক একজনের কথা কত কইরা লেখে। আমি বলেছি, কাগজে কলমে লিখতে গেলে আপনারা খারাপ হয়ে যাবেন গিয়া। লেখার দরকার নাই। আপনারা লিখবেন না। আমার বাড়ীতে আমার ছেলেমেয়েদের (সন্তানদের), ভাইবোনদের সেবা করলে কি আমি কাগজে দেব?

আমার ছোটভাইকে আমি সেবা করতে গেছি। আমার বড় ভাইরে আমি এই দিছি, মায়েরে এই দিছি, আপনারা লিখা দিবেন, এই কথা বলবো? সুতরাং এই মন নিয়ে যদি তোমরা সেবা করতে পার, তাই করবে। আর ঐ ফুটানির মন নিয়া সেবা করতে যেও না।

আমার ছোটভাইকে আমি সেবা করতে গেছি। আমার বড় ভাইরে আমি এই দিছি, মায়েরে এই দিছি, আপনারা লিখা দিবেন, এই কথা বলবো?

আমার সন্তানেরা বন্যার্ত্তদের উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছে। তারা এত জলে নেমে গেছে। পত্রিকার লোক সেখানে গেছে।

— আপনারা এইভাবে কাজ করছেন?

— হ্যাঁ করছি। দোহাই ধর্ম আপনারা (সাংবাদিকরা) আমাদের কথা লিখবেন না। যাদের নাম লেখা উচিত মনে করেন, যারা চাঁদা নেয়, collection ক'রে বেশী বেশী টাকা নেয়, তাদের কথা লেখেন গিয়া। আমাদের নাম লিখবেন না। প্রতিদিন ১২ হাজার রুটি বানাতে পারবেন? বাঁকুড়ার ভাইবোনেরা প্রতিদিন ১২ হাজার ক'রে রুটি বানাচ্ছে।

— ১২ হাজার রুটি রোজ কি করে করছেন ?

— দেখে আসুন। ১৭ হাজার রুটি রোজ তৈরী করে পাঠাচ্ছে।

তারা দেখে অবাক হয়ে গেছে। আপনাদের নাম, ফটো পত্রিকায় দেওয়া উচিত।

— নাম, ফটো পত্রিকায় দেবেন, কিসের জন্য ? আমরা দেখাবো, ভাইদের আমরা খাওয়াইতেছি। লজ্জা হওয়া উচিত আমাদের। আমার সন্তানরা জবাব দিয়েছে।

সুতরাং এই ফুটানির সেবা তোমরা করতে যেও না। সেবা করবে গোপনে, নীরবে। কিরকম বদনাম দিয়েছে আমাকে। ছোটবেলায় একটা কাজ করতে গিয়েছি। টাকা পয়সা নেই না তো। ধর্মের নামে টাকা নেওয়া নিষেধ। অন্য সম্প্রদায় থেকে আমার পিছনে লাগছে। নানাভাবে আমাকে নির্যাতন করার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা কম করেছে? সাংঘাতিক ভাবে চেষ্টা করেছে। আগের যে সরকার ছিল, সেই সরকার পর্যন্ত চেষ্টা করেছে। আমি পরোয়া করিনি। হয় ফাঁস, নয় খালাস। দেখি কে আসে, জিতে গেছি। হাইকোর্টে জিতেছি। সুপ্রিমকোর্টে জিতেছি। ভালোভাবেই জিতেছি। আমি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছি, দেখবো, তোমার কত হিম্মৎ আর আমার কত হিম্মৎ। আমি challenge করেছি। তোমার কত I.P.S., কত ম্যাজিস্ট্রেট আছে, আমি দেখবো। আমি ভয় পাইনি। আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। জোর করে আমাকে ফাঁসিয়ে কে কতটুকুনু কি করতে পারে? সহজে কারও সাথে লাগি না। কোনকিছুতে সহজে যাই না। খুচরা, খুচরা, খুচরা, খুচরা সব জলছিটানো ঝগড়া অনেকে করে তো।

আমি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছি, দেখবো, তোমার কত হিম্মৎ আর আমার কত হিম্মৎ।

তাই তোমাদের বলছি, ঝামেলা আসবে অনেক, ঝঞ্ঝাট আসবে অনেক। তোমাদের সাথে আমার বাপ-বেটা-বেটীর সম্পর্ক, সন্তানের সম্পর্ক, পিতাপুত্রের সম্পর্ক। যেইভাবে সম্পর্ক আজ গড়ে তুলেছি; যেইভাবে তোমরা আমার কাছে রয়েছ, যতই ঝড় আসুক, যে যাই-করুক, আমাদের সম্পর্কে যেন ফাটল না ধরে, লক্ষ্য রেখো। দ্বিতীয়তঃ আমরা যেইভাবে যেই মনস্থ করে কাজে অগ্রসর হচ্ছি, সেইকাজে কেউ আমাদের রুখতে পারবে না, এটা মনে রাখবে। আমরা তো রাজনীতিতে যাইতেছি না; গদীতেও হাত বাড়াচ্ছি না। গদীতে কে আইল, কে গেল কোন দরকার নাই আমাদের। অনেকে অনেকসময় খুঁত ধরে আমাদের। আমরা রাজনীতি করি। সন্তানদল রাজনীতি করে, সন্তানদল C.I.A.-র এজেন্ট। আবার ত্রিশূলকে অস্ত্র কয়। এদের (সন্তানদলের) কাছে অস্ত্রশস্ত্র আছে ইত্যাদি।

ত্রিশূল তো অস্ত্রই। ত্রিশূল হইল তে-কাইঠ্যা যন্ত্র। পূজার সময় পূজা করি। অন্যসময় অস্ত্র। কাজের সময় কাজ করি। কাজের সময় দরকার হয়তো, তখন লাগবে ত্রিশূল। তোমরা ঘরে ঘরে ত্রিশূল রাখবা। ত্রিশূল যদি কাজে লাগে, লাগবে আমাদের। তোমরা ত্রিশূল নিয়া বাইরাইয়া যাবা। ত্রিশূল নিয়া লক্ষ লক্ষ সন্তান নাইমা (নেমে) গেলে, কার সাধ্য আছে ত্রিশূলের বিপক্ষে চলতে পারে? কে ত্রিশূলের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরবে? আমি তো সেই বাপের ব্যাটা দেখিনা কাউকে। ত্রিশূলের কেরামতি দেখবা। ত্রিশূল রাখছে ঘরে ঘরে। ত্রিশূলের কেরামতি তখন দেখবা। মনে কোর না, এই ত্রিশূল ধরছো এমনে? আমি চাচ্ছি, আর কিছু না। এই শিব খাইয়া, না খাইয়া শ্মশানে মশানে পরে থাকতো। এইটা (ত্রিশূলটা) কিন্তু ছাড়ে নাই। এইটা নিয়াই সবসময় ঘুরতো। আর এইটা দিয়াই সব ছিটালে পাঠাইছে। একেবারে টাইট (Tight) কইরা দিয়া গেছে সমাজকে। তোমরা হাতে এইটা (ত্রিশূলটা) ঠিক কইরা রাইখা (রেখে) দিও। পূজার সময় পূজা করবে, একে সম্মান দেবে। এর মর্যাদা দেবে। ত্রিশূল হইল বাংলাদেশের (পূর্ববাংলার) তে-কাইঠ্যা যন্ত্র। শুধু একটা কথা মনে রাইখো, তে-কাইঠ্যা যন্ত্র। এই তে-কাইঠ্যা যন্ত্রের অনেক গুরুত্ব আছে।

ত্রিশূল তো অস্ত্রই। ত্রিশূল হইল তে-কাইঠ্যা যন্ত্র। পূজার সময় পূজা করি। অন্যসময় অস্ত্র। কাজের সময় কাজ করি। কাজের সময় দরকার হয়তো, তখন লাগবে ত্রিশূল। তোমরা ঘরে ঘরে ত্রিশূল রাখবা।

এইটা (ত্রিশূল) কারও শত্রুতা সাধন করার জন্য নয়, কারও বিপক্ষতা করার জন্য নয়। এইটা হইল ন্যায়ের দন্ড। এইটা ন্যায়ের কথাই বলবে। এই হিসাবেই আমরা এঁকে (ত্রিশূলকে) চিনি। এই মূলাধার। এই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। এই মূলাধারের কথা, মূল কথা সে (ত্রিশূল) বলবে। সুতরাং মূল কথা যদি এটা (ত্রিশূল) বলে, তবে মূলসুরের কথাই বলবে। তোমরা সেইভাবেই চলবে।

এইটা (ত্রিশূল) কারও শত্রুতা সাধন করার জন্য নয়, কারও বিপক্ষতা করার জন্য নয়। এইটা হইল ন্যায়ের দন্ড। এইটা ন্যায়ের কথাই বলবে। এই হিসাবেই আমরা এঁকে (ত্রিশূলকে) চিনি।

আজকে যদি আবার ত্রিশূল আমাদের ঘরে ঘরে আসে, আর দুষ্ট প্রকৃতির লোক আমাদের মা বোনেদের উপর অত্যাচার করে, তখন হাতের কনুই দিয়া কত আর করা যায়? তখন বাধ্য হইয়া তে-কাইঠ্যা যন্ত্রটারে (ত্রিশূলকে) উঠাবো। ঘরের যে শত্রু, তার কাছে তখন তে-কাইঠ্যা যন্ত্র এইরকম (অসুরের বুক লক্ষ্য করে মা দুর্গার হাতের ত্রিশূলের মতন) হইয়া যাবে। মনে রেখ, এই তে-কাইঠ্যা যন্ত্র (ত্রিশূল) তোমাদের সাথে কথা বলবে। এইটার কেরামতি আছে। এইটা (ত্রিশূল) যেমন তেমন যন্ত্র নয়। তাই আত্মরক্ষার মহা অস্ত্র, শয়তানের বিরুদ্ধে মহা অস্ত্র এবং সমাজকে স্বচ্ছতায় রাখার এইটা (ত্রিশূল) হইল একমাত্র অস্ত্র। এটা নিমকহারামির অস্ত্র নয়, ডাকাতির অস্ত্র নয়। এটা হচ্ছে ন্যায়ের অস্ত্র। যারা অন্যায়ের পথে সাহায্যকারী, যারা অন্যায়কারী, সেই দানবদের শায়েস্তা করার জন্য এই অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অস্ত্র রাজনীতির জন্য নয়, দলাদলির জন্য নয়, ব্যক্তিগত শত্রুতা সাধনের জন্য নয়। এটা হচ্ছে ব্যাপকতার জন্য। তাই তোমরা সেইভাবেই ঘরে ঘরে আজ ত্রিশূল নিয়ে রাখছো। এঁকে পূজা করছো। এঁর মর্যাদা, ত্রিশূলের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে। নিজেদের ঘরে গৃহ বিবাদের মধ্যে আবার এটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যেও না। মনে রেখো, কথাটা। ঘরের মধ্যে নিজেরা ঝগড়া করলে। তারপর বললে রাখ, এই ত্রিশূল দিয়া তরেই মারবো আগে। এই কথা বলতে যেও না। আইন করে দিলাম। এরকম আছে তো। একজন ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে বাড়ীতে

এইটার কেরামতি আছে। এইটা (ত্রিশূল) যেমন তেমন যন্ত্র নয়। তাই আত্মরক্ষার মহা অস্ত্র, শয়তানের বিরুদ্ধে মহা অস্ত্র এবং সমাজকে স্বচ্ছতায় রাখার এইটা (ত্রিশূল) হইল একমাত্র অস্ত্র।

কীর্তন করে। কারা যেন বাড়ীতে ঢিল মারে। দিনের পর দিন এরকম চলছে। রাম নারায়ণ রাম করতাছে। বাড়ীতে ঢিল মারতাছে। এরমধ্যে একদিন ক্ষিপ্ত হইয়া ত্রিশূল ধরছে। দ্যাখ্ ত্রিশূল পোঁতা আছে। যদি ত্রিশূল একবার উঠাই, আমি মরছি মরছি, তোরে নিয়াই মরবো। এই কথা বলতে শুরু করেছে। এই কথা কেমনে কেমনে আমার কানে এসে পৌঁছেছে। ওকে (সেই সন্তানকে) ডাক দিয়া বললাম, ত্রিশূল যে পুঁতছো, উঠাতে পারবে না। তোমার বাড়ীতে ঢিল মারুক, ঢিলের শব্দে শব্দে কীর্তন করবে।

— বাবা, এই কথা তো শুনি নাই।

— হ্যাঁ। একটা কইরা ঢিল দিব আর রাম নারায়ণ রাম করবা।

— আইচ্ছা বাবা। 'ও'-তো আনন্দ কইরা বাড়ীতে গেছে। বাবায় এই কথা কইছে। যত ঢিল দেয় রাম নারায়ণ রাম করে। ঠাস্ (ঢিল) রাম নারায়ণ রাম। ঠাস্ (ঢিল) রাম নারায়ণ রাম। ঠাস্ (ঢিল) রাম নারায়ণ রাম।

আশেপাশের লোক ভাবলো, ঢিল দেই আর রাম নারায়ণ রাম কয় দেখি। মেজাজ খারাপ কইরা আর ঢিল দেয় না। ঢিল বন্ধ হয়ে গেছে। তোমরা এইভাবে এটাকে (ত্রিশূলকে) ঘরে ঘরে রেখো। ছোট বড় সবরকমই রেখো। একেবারে এত বড় বড় রাখলে তো মুস্কিল। সবাই নাড়াচাড়া করতে পারবে না। যাদের বল (শক্তি) আছে, তারা পারবে। ছোট বড় সবরকমই রাখবে, পুজো টুজো করবে। তবে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, আমরা পূজা করছি। এটার অন্য কোন কারণ নেই। এটা মারপিট করার জন্য নয়, অন্য কিছুর জন্য নয়। ত্রিশূল শিবের হাতের ন্যায়ের দন্ড। ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে এঁকে আমরা সম্মান দিচ্ছি। বাবা ভোলানাথের অস্ত্রটারে আমরা নিজেদের হাতে আনছি। যাক, আর বেশীকিছু বলবো না। তোমরা আমার আশীর্বাদ নিও। রাম নারায়ণ রাম।

আশেপাশের লোক ভাবলে, ঢিল দেই আর রাম নারায়ণ রাম কয় দেখি। মেজাজ খারাপ কইরা আর ঢিল দেয় না। ঢিল বন্ধ হয়ে গেছে।

ত্রিশূল শিবের হাতের ন্যায়ের দন্ড। ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে এঁকে আমরা সম্মান দিচ্ছি। বাবা ভোলানাথের অস্ত্রটারে আমরা নিজেদের হাতে আনছি।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ পঞ্চম (৫-তম) জন্মতিথি, ১৯২৪

ভগবান — জল মাটি বাতাস এরকমই আমাদের ভগবান

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের বাল্য ও কৈশোর জীবনে তাঁর জন্মতিথি পালন করেছেন তাঁর ভক্তশিষ্যরা। ত্রিপুরা জেলার উজানচর কৃষ্ণনগরে (অধুনা বাংলাদেশে) তখন তিনি বসবাস করতেন। সেইসময়ে তাঁর বহুবিভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছেন বহু গ্রামবাসী ও তাঁর গুরুজনস্থানীয় আত্মীয়স্বজনগণ। বাল্য ও কৈশোর জীবনে তাঁর 'জন্মতিথি' বা শুভ উৎসব প্রসঙ্গে সামান্য কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা অনেকেই শুনেছি এইসব কাহিনী।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে, শিশুগোঁসাইকে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ভালবাসতেন। একটি চোরও শিশু গোঁসাইকে খুব ভালবাসত ও ভক্তি করতো। একদিন চুরি করতে যাবার আগে সে (চোরটি) শিশু ঠাকুরের (শিশু গোঁসাইর) ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করে বললো, গোঁসাই দেখ, ভালভাবে যেন চুরি করে আসতে পারি, যেন ধরা না পড়ি। একটি বাড়ীতে সিঁধ খুঁড়ে সে চুরি করতে গেছে। কিন্তু বাড়ীর লোকজন কিভাবে যেন টের পেয়ে গেছে, আর চোরকে করেছে তাড়া। চোর তো 'গোঁসাই, গোঁসাই বাঁচাও' বলে সামনেই একটা ডোবার ভিতরে লাফিয়ে পড়েছে। গৃহস্থরা কিন্তু ডোবার দিকেই গেল না। চোরটিও রক্ষা পেয়ে গেল। তারপর সে এসে শিশু ঠাকুরের পায়ে ধরে বলে, গোঁসাই এ যাত্রা খুব জোর বেঁচে গেছি।

এরপর শিশু ঠাকুর, শিশু গোঁসাই তাকে চুরি করতে নিষেধ করেন এবং ফলটল বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতে বলেন।

শিশু গোঁসাইর কথামত সেই চোরটি চুরি করা ছেড়ে দিল এবং ফলটল বিক্রী করে বেশ দুপয়সা আয় করলো। শুভ দীপান্বিতা দিবসে সে গোঁসাইর জন্মোৎসবের আয়োজন করেছে। বহুলোক বহুজায়গা হতে এসেছে। তার কথা জানাজানি হয়ে গেছে। সে শিশু গোঁসাইকে কাঁধের উপর বসিয়ে এক দৌড়ে উৎসব প্রাঙ্গনে এনে হাজির। সবাই খুব খুশী । শিশু গোঁসাইকে কাছে পেয়ে তাদের আনন্দ ধরে না। সকলের অনুরোধে শিশু গোঁসাই সেখানে কুমিল্লার ভাষায় আধা শুদ্ধ আধা গ্রাম্য কথায় ছোট্টো একটা ভাষণ ও দিয়েছিলেন সেদিন।

শিশু গোঁসাই বলেছিলেন, আপনারা সকলে আইছেন (এসেছেন) জন্মোৎসবের খবর পাইয়া (পেয়ে)। দেখেন ভগবান আমাগো (আমাদের) হকলের লাইগ্যাই আইছেন (সকলের জন্যই এসেছেন)। আপনারা তো চিন্তা করছেন, ভগবান বুঝি আমার লাইগ্যাই (জন্যই) আইয়া (এসে) পড়ছেন, তা নয়। আপনাদের আমাদের হকলের লাইগ্যাই এক ভগবান। ভগবান যে কি জানেন তো — না জানেন না? আমরা যেমন চলাফেরা করি, ভগবান এমনই করেন। এই যে মাটি জল এরকমই আমাদের ভগবান। এই মাটি জল দিয়াই ভগবান তৈরী, গাছপালাও — সবটাই ভগবান। আপনারা ভাবছেন শুধু কীর্তন করলে ভগবানরে পাইবেন কি না? ভগবান পাইবেন কি পাইবেন না, এই কথা মোটেই ভাববেন না। হকলেই (সকলেই) আমরা পাইয়াই আছি। হকলেরই ভগবান পাওয়া হইয়া গেছে। সুতরাং আমরা ভগবানকে পাইছি কি না, চিন্তা করার কোন দরকার নাই। কিন্তু ভগবানরে যে পাইলাম, তা তো বুঝতে পারতাছি না। ঠিক কথা - সাগরে যে মাছ আছে, সাগরকে বুঝতে তার অসুবিধা হয়। সেইরকম এই দেশ এই পৃথিবী সবটার মধ্যেই আছেন সেই ভগবান।"

"আপনারা নিশ্চিন্ত থাকেন, আপনাদেরও দর্শন হইব, অনুভূতি হইব। ভগবানরে দেখতেও পারবেন, বুঝতেও পারবেন। তা যদি না হইত, আপনারা এই জগতে আইতেই (আসতেই) পারতেন না। যারা বাইচ্যা (বেঁচে) আছেন শুধু তারা নয়, যারা মইর‍্যা (মরে) গেছেন, তারাও পাইবেন — কারণ তারা কেউ মরেন নাই*। সকলের দর্শন হইবে অনিবার্য। সকলেরই হইতে

---

* শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেন, মৃত্যু একটা পরিবর্ত্তন মাত্র। আর কিছু নয়।

বাধ্য, হইবার জন্যই হকলের আওয়ন (সকলের আসা)।'' সেই বাচ্চা বয়সের কথা; শুদ্ধ ভাষা, গ্রাম্য ভাষা মিশিয়ে এলোমেলোভাবে তিনি বলেছিলেন অধ্যাত্ম সাধনার এই নিগূঢ় তত্ত্ব।

শুভ এয়োদশ (১৩-তম) জন্মতিথি, ১৯৩২

শিশু ঠাকুরের বয়স একটু বেড়েছে। এই ১২/১৩ বৎসর হবে। এখন সবাই তাঁকে বলে, 'বালক ঠাকুর' বালক গোঁসাই' 'বালক ব্রহ্মচারী' ইত্যাদি। একবার বালক গোঁসাই নৌকা করে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন পাঠশালার আনন্দ মাষ্টার ও আরও চারজন ভক্ত। নৌকা করে কিছুদূর যাবার পর নৌকা থেকে নেমে তিনি হাঁটাপথে রওনা দিলেন। অন্যরাও তাঁর পিছন পিছন যাচ্ছেন। খানিকটা পথ যেতেই দেখা গেল, নেমন্তন্নের পাতা পড়েছে, খেতে বসেছে সবাই। সবার সাথে বালক গোঁসাইও বসে গেলেন একটি পাতা নিয়ে। সবাই তো অবাক। গোঁসাই-র নির্দেশ মত তখন ভক্তরাও বসে গেলেন, মাষ্টার মশাইও বাদ গেলেন না।

মাষ্টার — বাবা, এটা কি করলে? এ কাদের বাড়ী? কই, কেউ তো বললো না খেতে বসতে?

বালক গোঁসাই — হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলবে, বলবে। দেখছেন না, ওখানে কিসের এক উৎসব চলছে, সেই উপলক্ষ্যেই খাবার ব্যবস্থা। তাই আমরাও বসে পড়লাম। (বালক গোঁসাই মাথায় একটা গামছা বেঁধে নিয়েছেন। হঠাৎ দেখলে চেনবার উপায় নেই।)

মাষ্টার — এই যে খাচ্ছি, কিসের ব্যাপার? আমরা তো নিমন্ত্রিত নই।

বালক গোঁসাই — ব্যাপার যাই হোক, হবেই কিছু একটা। হয় বিয়ে, নয় শ্রাদ্ধ, নয় অন্নপ্রাশন - একটা কিছু হবেই।

মাষ্টার — আচ্ছা, আশেপাশে লোক যে বিড়বিড় করছে।

বালক গোঁসাই — আমরাও ঠোঁট নাড়ি।

মাষ্টার (তাদের উদ্দেশ্য করে) - কি বলছেন?

তা'রা - এও জানেন না?

মাষ্টার - (কায়দা করে) এই যে খাওয়ার ব্যবস্থা, এটা কি প্রতিবছরই হয়?

তারা - কেন গতবছর আসেননি? হাজার হাজার লোক আসে।

মাষ্টার (গোঁসাইকে) - জিজ্ঞাসা তো করলাম। কিন্তু এক জায়গায়ই রয়ে গেলাম।

বালক গোঁসাই — আচ্ছা, খেয়ে যান তো আগে। গোঁসাই চটপট খেয়েটেয়ে তাঁর পাতাটাতা গুটিয়ে হাতে তুলে হাঁটতে শুরু করলেন।

মাষ্টার — বাবা, কোথায় যাচ্ছ?

বালক গোঁসাই — পাতাটা নিয়ে যাচ্ছি।

মাষ্টার — ফেলবে কোথায়?

বালক গোঁসাই — কেন, সবাই যেখানে ফেলছে। একটি ছেলে সেদিকে পরিবেশন করছিল। গোঁসাই তাকে কাছে ধরে নিয়ে এসে নিজের মাথার গামছাটা খুলে চেহারাটা একবার ওকে দেখিয়ে দিলেন। ছেলেটি তো দেখেই 'গোঁসাই' 'গোঁসাই' করতে আরম্ভ করেছে।

বালক গোঁসাই — (ছেলেটাকে) চিৎকার করিস্ না। চুপ কর। প্রসাদটা নে। মাষ্টারমশাইয়ের কাছে এসে বললেন, আমার কথা কারও কাছে কিছু বলবেন না। যা বলবো, শুনে যান। ঐখানে অন্য কোন কথা বলবেন না। এখন যান ঐখানে - ভিতরে গিয়ে দেখে আসেন, ব্যাপারটা কি হচ্ছে।

মাষ্টার মশাই গিয়ে দেখেন মহাসমারোহে বালক গোঁসাইর জন্মোৎসব হচ্ছে। চারিদিকে কেবল গোঁসাইরই ফটো।

মাষ্টার — বালক গোঁসাই কোথায়?

তারা — গোঁসাই অনেক দূরে আছেন। আসতে পারেননি।

মাষ্টার এসে তখন গোঁসাইকে বলছেন, ''বাবা, সব তোমারই খেলা। তোমাকে নিয়ে এত হৈ চৈ করছে, আর তুমি এদিকে মাঠে বসে খেয়ে ফিরে চললে।''

এদিকে বালক গোঁসাই-এর ওই প্রসাদ নিয়ে উৎসব প্রাঙ্গনে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। এ বলে, 'গোঁসাইকে দেখেছি।' সে বলে, 'গোঁসাইকে দেখেছি।' বালক গোঁসাই ততক্ষণে হাঁটতে শুরু করেছেন মাষ্টারমশায় ও ভক্তদের নিয়ে। মাষ্টারমশাই রাস্তায় আর লোকজনের মাঝে গোঁসাইর সঙ্গে কোন কথা বললেন না। পরে অনেক দূর গিয়ে মাষ্টারমশাই দেখেন আশেপাশে আর কেহ নাই বালক গোঁসাইর কাছে। তখন সুযোগ বুঝে বললেন - বাবা, কি সাংঘাতিক তুমি। তোমার জন্য গামলা গামলা ভোগ, আর তুমি সবার সঙ্গে পাতায় বসে খেয়ে এলে! তোমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমায় যখন ধরবে, আমি কি জবাব দেব? সবাই বলবে, আপনি তো মাষ্টারমশাই, আপনি তো বলতে পারতেন।

কিছু না বলে গোঁসাই হাসতে লাগলেন। মাষ্টারমশাই নিজের গ্রামে ফিরে এসে কারও কাছে বলবেন না ব'লে কিন্তু সবাইকেই বলতে আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল সকলের মধ্যে।

শুভ চতুর্দশ (১৪-তম) জন্মতিথি ১৯৩৩

বালক গোঁসাইর তখন ১৩/১৪ বৎসর বয়স। সেইসময় একবার কালীপূজার দিন গোঁসাইর ফটো টাঙিয়ে হৈ হল্লা করে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হচ্ছে। বালক গোঁসাই এবারও মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে কয়েকটি ছেলেকে সাথে নিয়ে ছদ্মবেশে সেই উৎসবে গেছেন। গোঁসাই তাদের নিয়ে মাঠেই বসেছেন খেতে।

বালক গোঁসাই — আমাদের একটু তাড়াতাড়ি বসিয়ে দিন।

উত্তর — যে যেখানে পারেন, বসে যান।

বালক গোঁসাই — আপনাদের ঠাকুর কোথায়?

উত্তর — ওখানে যাওয়া যাবে না, বড় ভিড়।

বালক গোঁসাই — আর একটা বেগুন ভাজা দিন না।

উত্তর — না, বেগুনভাজা আর দেওয়া যাবে না। একটা করেই বেগুনভাজা ধরা হয়েছে। কাজেই আর দেওয়া সম্ভব নয়।

কিছুতেই গোঁসাইকে আর একখানা বেগুনভাজা দিল না কেউ। গোঁসাইর সাথের ছেলেরা হতভম্ব হয়ে গেছে। যাঁর উৎসব তিনি ৫/৬ বার চেয়েও একটি বেগুনভাজা পেলেন না। একজন শিষ্যও অনুরোধ করলেন, বাচ্চা ছেলে চাইছে, দিয়ে দিন না। কোন ফলই হল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত।

বালক গোঁসাই — আচ্ছা, আপনাদের ঠাকুরের বয়স কত?

উত্তর — ১৩/১৪ বৎসর হবে।

বালক গোঁসাই — সেই হিসাবেও তো দেওয়া উচিত আমাকে। আমার বয়সও ১৩/১৪ বৎসর হবে।

তবুও কান দিলনা কেউ। তারপর খিচুরি আর লাবড়া দিয়ে শেষ করলো। ফিরে যাওয়ার সময় গোঁসাই একটি চিঠি লিখলেন, ''আমি এসেছিলাম, খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। একটা বেগুনভাজা চেয়েছিলাম, দিল না। রবীনও (ভক্তশিষ্য) বলেছিল, কিন্তু দিল না।'' বালতি হাতে করে একটা ছেলে পরিবেশন করছিল। তাকে একধারে নিয়ে বালক গোঁসাই ঐ চিঠিখানা দিলেন এবং ওখানে কলাগাছকে ঘিরে যে জন্মোৎসব চলেছে সেখানে ঐ চিঠিখানা দিতে বললেন। ছেলেটি উৎসব-প্রাঙ্গনে গিয়ে চিঠিখানা পড়েই ধুপ্ করে নীচে পড়ে গিয়ে 'ঠাকুর', 'ঠাকুর' করতে আরম্ভ করলো। তারপর বালক গোঁসাইকে সবাই খুঁজতে বের হলো চারিদিকে। আর ঐ যে ছেলেটি বেগুনভাজা দেয়নি, সে দুঃখে ও যন্ত্রণায় নিজের মাথার রক্ত নিজেই বার করে ফেললো। গোঁসাইকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। জন্মোৎসবের উদ্যোক্তারা ঠিক করলো, সামনের বছর হতে আর বেগুনভাজা করা হবে না।

এই ভাবে 'বালক ঠাকুর', 'বালক গোঁসাই' সাধারণের সাথে অত্যন্ত সাধারণ হয়ে মিশে নিজের অসাধারণ সুর বাজিয়ে গিয়েছেন সারাজীবন। তাঁর মতো জন্মসিদ্ধ মহানের পক্ষেই এটা সম্ভব।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ ষষ্ঠ (৬-তম) জন্মতিথি

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ

পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ বহু ক্লাসে বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন তাঁর বাল্যবয়সের কথা ও কৈশোর জীবনের কথা। কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, ''বাংলাদেশে আমি তিনটি diamond (হীরা) ফেলে এসেছি। তাদের কঠিন শাস্তি দিয়ে এসেছি। আইনের ঘরে বেঁধে রেখে এসেছি। তারা যতদিন বেঁচে থাকবে, আমার সাথে দেখা করতে পারবে না। আমার কাছে আসতে পারবে না। আমার আদেশ পালন করে, আমার উপদেশ ও নির্দেশ মাথায় নিয়ে তাদের চলতে হবে। তারা সেই কঠিন নিয়মই মাথা পেতে নিয়েছে এবং আজ অবধি প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। মৃত্যুর পরে তাদের নিয়ে যেতে, সেই অনন্তধামে পৌঁছে দিতে আমার কোন অসুবিধাই হবে না। আমি ইঞ্জিন হয়ে অতি সহজেই তাদের পৌঁছে দিতে পারবো। এখনও পর্যন্ত যা দেখছি, ওরা ট্রেনের 1st Class Compartment-এ অপেক্ষা করছে।'' পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের এই পরম তিনজন ভক্ত, তিনটি diamond — হেনা, শেফা, জয়ন্তী।

শেফা ও জয়ন্তী ছিল বালক ঠাকুরের (শ্রীশ্রীঠাকুরের) পাঠশালার সাথী। তারা একদিনে কলাপাতায় অ আ লিখেছেন। শেফা জমিদার বাড়ীর (হাজরা বাড়ীর) মেয়ে। তাদের বাড়ীর গৃহদেবতা বালগোপাল। তাঁর নাম ছিল 'দধিবাহন'। ঐটুকু বয়সেই শেফা ও জয়ন্তী 'বালক ঠাকুর' যে অন্য

সব ছোট ছোট ছেলেদের চেয়ে আলাদা; তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) যে দেবতা, তিনি ইচ্ছা করলে যা খুশী তাই করতে পারেন, এটা বুঝে নিয়েছিল। তাই সহপাঠী হলেও, খেলার সাথী হলেও তারা 'বালক ঠাকুর'কে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মাত্র ছয় বছর বয়সে শেফা পাঠশালার অন্যান্য সাথীদের নিয়ে বালক ঠাকুরের জন্মতিথি পালন করেছিল। শেফা ও জয়ন্তী দুজনেই বালক ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বলেছিল, "তুমি আমাদের দধিবাহন, তুমি আমাদের গোপাল ঠাকুর। তুমি আমাদের ভাল কইরো। চিরদিন তোমার চরণে রাইখো। আমরা যেন চিরদিন তোমার চরণে থাকতে পারি।"

'বালক ঠাকুর' ঐ বাল্যবয়সে, মাত্র ছয় বছর বয়সে পাঠশালার সাথীদের এই ভক্তি ও নিষ্ঠায় এবং তাদের পূজায় এত খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি কথা দিয়েছিলেন, "চিরদিন তোমরা আমার কাছে থাকবে।" এই কথা শুনে শেফার আবার কি কান্না। 'বালক ঠাকুর' তাকে বলেন, 'তুমি কাঁদছো কেন?'

শেফা বলে, 'আমি থাকতে পারবো তো? তুমি আমাকে রাখবে তো?'

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে বলেন, 'হ্যাঁ রাখবো।' তবে মেয়ের কান্না থামে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে পরবর্ত্তীকালে উচ্চশিক্ষার জন্য শেফা অক্সফোর্ডে যান এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা নিয়ে যেন সদা সর্বদা থাকতে পারেন, এটাই ছিল তার জীবনের মূলকথা।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-